কুরআন সিরিজ : ১

কুরআন পরিচিতি

উলুমুল কুরআন ও উসুলুত তাফসীর
বিষয়ে প্রামাণিক উপস্থাপনা
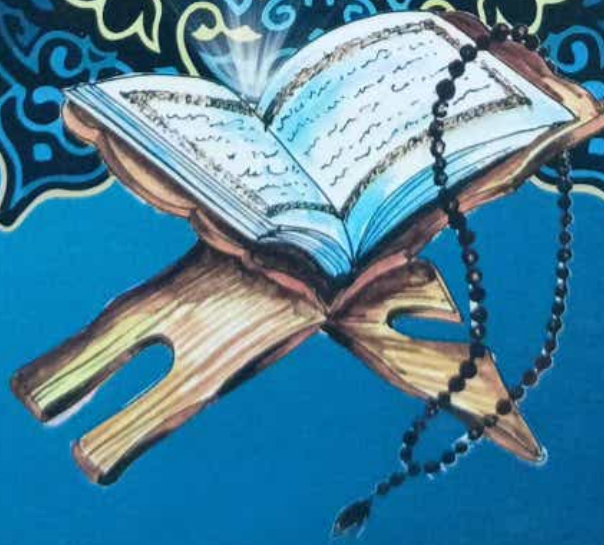
শাইখ আব্দুল্লাহ মাহবুব

আল-ইহদা

আমার প্রাণপ্রিয় উসতাদ, যার হাতে আমার দীনী শিক্ষার হাতেখড়ি; মাদরাসাতুল ইহসান আল আরাবিয়্যাহ, উত্তরা, ঢাকা-র স্বনামধন্য মুহতামিম মাওলানা মুনিরুজ্জামান দা. বা.।

আমার জীবনের পাঁচটি বসন্ত কেটেছে এই ফুলবাগানে। তিনি আমাকে নিজ সন্তানের মত স্নেহের চাদরে আগলে রেখে ইলমে দীন শিক্ষা দান করেছেন। আমার প্রতি তাঁর ইহসান কোনদিনও ভুলবার নয়। আল্লাহ তাআলা তাকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

–আব্দুল্লাহ মাহবুব

লেখক পরিচিতি

নাম ও জন্ম

আবদুল্লাহ আল মাহবুব। পিতা মরহুম আমিনুল ইসলাম রহ. ছিলেন একজন সরকারী চাকুরীজীবি। তার সততা ও একনিষ্ঠতা লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্বপুরুষদের বসবাস ছিল কুমিল্লার সদর দক্ষিণ চকবাজারে। চাকুরীর সুবাধে তিনি হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় বসবাস শুরু করে। সেই সূত্রে লেখকের ১ লা জানুয়ারী ১৯৯৬ ই. শুভ জন্ম লাভ হয় সেখানেই। লেখকের বর্ণাঢ্য শৈশব কেটেছে সেখানের সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির মাঝে।

শিক্ষা:

লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় মায়ের হাতে। শিক্ষাকালের প্রাথমিক দিকে তিনি নোয়াখালির প্রসিদ্ধ মাদরাসা জামিয়া কলাকোপায় ভর্তি হন এবং সেখানে উর্দূ, ফার্সীসহ প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়া ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত দারুল উলূম বাজুকায় পড়ালেখা করেন।

তারপর তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং মাদরাসাতুল ইহসান আল-আরাবিয়্যাহ, উত্তরা, ঢাকায় ভর্তি হয়ে ১ম বর্ষ থেকে জালালাইন জামাত পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যয়ন করেন। প্রত্যেক জামাতে তিনি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। অতঃপর ফযীলত ও তাকমীল পড়েন দেশের সুপরিচিত বিদ্যাপীঠ জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদরাসায়। সেখানেও তিনি তাঁর জামাতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন।

উচ্চতর গবেষণা

উচ্চতর গবেষণা ও পড়ালেখার জন্য তিনি দাওরায়ে হাদীস পাশ করে জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগে ইফতা বিভাগে ভর্তি হন। সেখানে দুই বছর অত্যন্ত সুনামের সাথে ফিকহ ও ফতোয়া চর্চা করেন। এ বিভাগে পড়াকালীনও তিনি মেধাতালিকায় স্থান লাভ করেন।

ইলমের পিপাসায় বিদেশ ভ্রমণঃ

লেখক উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় ও ইলমের পিপাসায় মাতৃভূমি বাংলাদেশের মায়া ত্যাগ করে গমন করেন ভারতের বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে তিনি পুনরায় দাওরায়ে হাদীস অধ্যয়ন করেন। সর্বোচ্চ নাম্বার শতকরা ৮৮.০৬% নাম্বার (আওসাত) পেয়ে উত্তীর্ণ হন।

মেধার সাক্ষরঃ

লেখক অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও অমায়িক আখলাকের অধিকারী। মাদরাসাতুল ইহসানে পড়াকালীন প্রত্যেক জামাতে তিনি প্রথম স্থান লাভ করেন। জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগে পড়াকালীনও প্রত্যেক জামাতে মেধাতালিকায় স্থান লাভ করেন। তাকমীল জামাতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাবোর্ড বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়্যায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সারা বাংলাদেশে মেধা তালিকা লাভ করেন। এ ছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতে পড়াকালীন সর্বোচ্চ রেজাল্ট আওসাত মার্ক পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবনঃ

তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করার পর দীনী ইলমের খেদমতে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। সে সুবাধে মারকাযু শাইখিল ইসলাম আল-মাদানী ঢাকা'য় ইফতা বিভাগের মুশরীফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর বর্তমানে মুরব্বীদের পরামর্শক্রমে তিনি জামিয়া ইমাম আবু হানীফা রহ.-এ শিক্ষাসচিব ও সিনিয়র মুহাদ্দিসের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রকাশিত রচনাবলী:

১। নূরুল আনওয়ার-এর তাহ্কীক, তালীক ওমতকাদ্দিমা সংযোজন
(প্রকাশক, মাকতাবাতুত তাকওয়া-বাংলাবাজার, ঢাকা)

২। শরহে বেকায়া-২ খণ্ড এর তাহ্কীক ও তালীক ওমতকাদ্দিমা সংযোজন
(প্রকাশক, মাকতাবাতুত তাকওয়া-বাংলাবাজার, ঢাকা)

৩। কুরআন পরিচিতি
(প্রকাশক, মাকতাবাতুন নূর-বাংলাবাজার, ঢাকা)

৩। হাদীস ও আসারের আলোকে মুমিনের বারো মাস
(প্রকাশিতব্য)

৪। হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার অবদান
(প্রকাশিতব্য- মাকতাবাতুত তাকওয়া-বাংলাবাজার, ঢাকা)

মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল
মুশরিফ: উচ্চতর আরবী সাহিত্য বিভাগ-
মারকাযু শাইখিল ইসলাম আল-মাদানী ঢাকা।
লেখক ও সম্পাদক: মাকতাবাতুত তাকওয়া,
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ، وَجَعَلَهُ تَذْكِرَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ، وَلَا تَنْتَهِيْ بَرَكَاتُهُ، وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه إِلَّا بِمَا شَاءَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِه وَصَحْبِه، أَمَّا بَعْدُ:

পবিত্র কুরআনে কারীম আল্লাহর কালাম। তিনি তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যেন তিনি এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের আলোকে কুফর, শিরক, যুলুম নির্যাতন, মারামারি-কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাধ, হানাহানি, লুটতরাজসহ হাজারো পাপাচারের অমানিশায় নিমজ্জিত মানুষদেরকে হেদায়েতের আলোর পথে পরিচালিত করতে পারেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শান্তি ও সত্যের পথ প্রর্দশন করে সোনালী ইতিহাস হিসেবে পরবর্তীদের কাছে স্মৃতিময় করে রেখে যান। যুগ যুগ ধরে যে জাতি পাপাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তারা যখন অনাবিল শান্তি সুখের আলোকিত পথ পেল তখন তাদের আনন্দের আর সীমা রইল না। নিভু নিভু বাতি যেন আবার জ্বলে উঠল এবং একটি মুমূর্ষু প্রাণী যেন আবার প্রাণ ফিরে পেল। তারা নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। নতুন করে বাঁচতে শুরু করল। এমন এক কলুষমুক্ত আলোকিত জীবন ফিরে পেল তারা, যা পৃথিবী বিগত পাঁচশত বছরে দেখতে পায় নি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সাহচর্য পেয়ে ধন্য হল তাঁরা। নিজেদেরকে দ্বীনের তরে বিলিয়ে দিল। কতই ভাগ্যবান তারা, যারা

ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিল এবং ইসলামের রজ্জু আঁকড়ে ধরলো এবং বর্ণ বিভেদ ভুলে গিয়ে সকলই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেল! আর যাদের কপালে দুর্ভাগ্য লেখা আছে তারা তো চিরকালই দুর্ভাগা। তাদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ তাআলা কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের ইন্দ্রিয় শক্তিকে মোহর মেরে দিয়েছেন। (মা'আজাল্লাহ)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًاۙ۝۹ وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۝۱۰

"এ কুরআন সর্বাধিক সরল পথ প্রদর্শন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।"[১]

আল-কুরআনুল কারীম সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। তার নেই কোন তুলনা। কুরআনের ইলম, বা জ্ঞান অর্জন করাও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। সব শাস্ত্রের মূল হল আল-কুরআনুল কারীম। এতে ছোট পরিসর থেকে বিশ্বব্যাপী সকল পরিসরে জীবন সমস্যার সমাধান রয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কৃত বিষয় কুরআনে আরো চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কুরআনের সত্যতার জন্য তা সহায়ক নয় কি? তাই কুরআন শিক্ষালাভ করা ও কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা পৃথিবীর সকল শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে অধিক উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম সে ব্যক্তি, যে কুরআন নিজে শিখে ও অন্যকে শিখায়।[২]

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল: ৯-১০

২. সহীহ বুখারী- ৫০২৭, আবু দাউদ- ১৪৫২

আল্লামা ইবনে খালোয়া রহ. বলেন,

الاِشْتِغَالُ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيْمِه وَالْبَحْثِ عَنْ عُلُوْمِه لَيْسَ كَالْاِشْتِغَالِ كَسَائِرِ أَصْنَافِ الْعُلُوْمِ لِأَنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِه

"কুরআন ও কুরআনের জ্ঞান শিখা ও শিখানো অন্যান্য জ্ঞান শিখার মত নয়। কেননা, অন্যান্য জ্ঞানের উপর কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সৃষ্টিজীবের উপর আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের মত।"[৩]

সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগ থেকে তাবেয়ীন ও ইমামগণ যুগে যুগে কুরআন সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাদের অক্লান্ত ত্যাগ ও সীমাহীন আন্তরিকতার কারণে আজ অবধি কুরআনুল কারীম সহীহভাবে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। আল্লাহ তাআলা নিজেই উল্লেখ করেছেন, "কুরআন আমি নাযিল করেছি। আর আমিই তা সংরক্ষণ করবো"। (প্রত্যেক যুগে একদল মানুষকে নিযুক্ত করে দিবেন যারা কুরআন সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত থাকবে)।[৪]

প্রত্যেক যুগেই উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ বিভিন্নভাবে কুরআনের খিদমত করে গেছেন। কুরআনের সহীহ কিরাত সংরক্ষণ, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, অনুবাদ ও কুরআনের উলূম সম্পর্কে লিখে আল্লাহ সুসংবাদপ্রাপ্ত দলে তাদের নাম লেখিয়েছেন। আসলাফগণের দিলের তামান্না ছিলো তারা যেন কুরআনে বর্ণিত 'হাফিজীন' এর দলে থাকতে পারেন।

উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তাফসীর সম্পর্কে ইসলামের আদি যুগ থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত অনেকেই কলম ধরেছেন। মুতাকাদ্দেমীনদের অন্যতম হলেন, আল্লামা যুরকানী রহ.। তিনি "মানাহিলুল ইরফান" রচনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন যারকাশী রহ.; তিনি রচনা করেছেন "আল বুরহান ফী তাফসীরিল কুরআন"। অতঃপর তাফসীরে জালালাইনের লেখক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতি রহ. তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-ইতকান' কিতাবটি রচনা করেন।

৩. ই'রাবুল ক্বিরাআতিস সাব'- ১/৩৫
৪. সূরা হিজর- ৯

পরবর্তী সময়কালে এ ব্যাপারে বহুগ্রন্থ রচিত হয়েছে। মান্নান আল কাত্তান "মাবাহিছ ফী তাফসীরিল কুরআন" এবং ড. গানেম কাদ্দুরী আল-হামদ "মাহাযারাত ফী তাফসীরিল কুরআন" ও ড. মুস্তফা "কিতাবুল ওয়াযিহ ফী উলূমিল কুরআন" রচনা করেন। আমাদের সময়কালে উর্দূ ভাষায় আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন "উলূমুল কুরআন"।

এসব কিতাব অধমের মুতালাআ করার সুযোগ হয়েছে এবং আলোচিত আমার এ গ্রন্থটি রচনা করার সময় এসব কিতাব সামনে ছিলো। আমি আমার বক্ষ্যমাণ এ রিসালায় উলূমুল কুরআন ও উসূলুত তাফসীরের আলোচনাগুলো সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করার প্রয়াস চালিয়েছি। যাতে দীর্ঘ আলোচনা পাঠককে মূল বিষয় আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়ে যায়। অলসতার চাদরে আবৃত হয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অধিক পরিমাণ পড়ার চেয়ে উদ্যমতার সাথে অল্প পড়াই শ্রেয় ও অধিক উপকারী।

আমি পুরো কিতাবকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি এবং প্রত্যেকটি অধ্যায়ে রয়েছে বিস্তারিত আলোচনা।

১। কুরআনঃ পরিচিতি ও সংকলনের ইতিহাস

- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যেভাবে ওহী নাযিল হত
- কুরআনে কারীমের সর্বপ্রথম সংকলক কে ছিলেন? একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
- মাসহাফে আবু বকর রাযি. ও মাসহাফে উসমান রাযি.-এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য
- মাক্কী মাদানী আয়াতঃ পরিচিতি ও আলামতসমূহ
- সংক্ষিপ্ত আকারে সহীহ হাদীসের আলোকে আমলী সূরাসমূহের ফযীলত
- কুরআন তেলাওয়াতের সময় যেসব বিষয় লক্ষণীয়
- কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ
- দলিলের আলোকে আমলী সূরাসমূহের ফাযায়েল

- কুরআন তেলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণের বিধান
- স্বর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করার বিধান ও কায়দা-কানুন

২। *তাফসীর শাস্ত্র: পরিচিতি ও সংকলনের ইতিহাস*

- যিনি ছিলেন প্রথম মুফাসসির
- তাফসীর শাস্ত্রের উসূল ও কাওয়ায়েদ
- কুরআনের তাফসীর করার পূর্বশর্ত
- প্রসিদ্ধ কিছু তাফসীরগ্রন্থের পরিচিতি ও মুফাসসিরীনে কেরামের জীবনী

৩। *শানে নুযূল: পরিচিতি ও ইতিহাস*

- শানে নুযূল সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা ও ফাওয়ায়েদ
- শানে নুযূল সম্পৃক্ত বিধি-বিধান
- শানে নুযূল বিষয়ক কিছু কিতাব পরিচিতি

৪। *নাসেখ-মানসুখ: পরিচিতি ও প্রকারভেদ*

- এ শাস্ত্র সম্পর্কে কেন ধারণা রাখা প্রয়োজন
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদস্খলন হয় এ শাস্ত্র সম্পর্কে ইলম না থাকার কারণে
- নাসেখ-মানসুখ বিষয়ক বিধানসমূহ
- এ শাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলী

৫। *কুরআনের অনুবাদ*

- আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার হিকমতসমূহ
- তরজমা শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ
- অনুবাদ করার শর্তসমূহ
- কুরআন অনুবাদ করার বিধান
- বাংলা ভাষায় যিনি সর্বপ্রথম অনুবাদ করেছিলেন

রিসালাটি মূলত আল কুরআনুল কারীমের প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। দরসে নেযামীর কাফিয়া, শরহে বেকায়া, জালালাইন ও মেশকাত জামাতের ছাত্রদের জন্য মুফীদ হবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি অধমের এ ক্ষুদ্র খেদমত ও প্রয়াসের কারণে আল্লাহ আমাকে "হাফিজীন"দের দলবদ্ধ করে নাজাতের ওসিলা করবেন।

বই প্রকাশের আজকের এ আনন্দঘন মূহুর্তে আমি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমার এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বহুবিধ সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট লেখক ও আদীব, বন্ধুবর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল হাফিযাহুল্লাহ (মুশরিফ, উচ্চতর আরবী সাহিত্য বিভাগঃ মারকাযু শাইখিল ইসলাম আল-মাদানী ঢাকা। লেখক ও সম্পাদকঃ মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার ঢাকা) যিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বইটি আদ্যপান্ত সম্পাদনা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন। এ ছাড়া যারা এ প্রকাশের জন্য অন্তরের অন্তস্তল থেকে দুআ করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি মাকতাবাতুন নূর-এর স্বত্বাধিকারী মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন-এর। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ বইটি প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জাযাহুল্লাহু আহসানাল জাযা।

সর্বোপরি মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। নির্ভুল থাকা খালেকের গুণ। তাই পাঠক এতে কোন ধরনের ভুল বা পদস্খলনের ব্যাপারে অবগত হলে আমাদেরকে জানালে আমরা শ্রদ্ধার সাথে তা গ্রহণ করব ও মূল্যায়ন করব ইনশাআল্লাহ।

"سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ"

–আব্দুল্লাহ মাহবুব
৩০/৬/২০ঈ. রোজ মঙ্গলবার

সূচিপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

কুরআন পার্ট-৩

বিষয় | পৃষ্ঠা

তাফসীর পার্ট -৪

বিষয় | পৃষ্ঠা

পার্ট-৫

বিষয় | পৃষ্ঠা

পার্ট-৬

পার্ট-৭

কুরআন পার্ট-১

এ অধ্যায়ে রয়েছে–

- ✓ 'কুরআন' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ
- ✓ নামকরণের কারণসমূহ
- ✓ কুরআনের নামসমূহ
- ✓ কুরআন ও হাদীসে কুদসির মাঝে পার্থক্য
- ✓ কুরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ✓ 'ওহী' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ
- ✓ ওহীর প্রকারভেদ
- ✓ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেভাবে ওহী আসত

'কুরআন' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

কুরআনের বিভিন্ন নাম রয়েছে। তবে 'কুরআন' নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এ নামটি মোট ৬১টি স্থানে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে 'কুরআন' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

'কুরআন'শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়।

১. এটি একটি মাসদারে ইসমি। قَرَأَ- يَقْرَأُ- قِرَاءَةً- قُرْآنًا থেকে নির্গত। এটি فُعْلَانٌ এর ওযনে একটি মাসদার। যেমন, شُكْرَانٌ، غُفْرَانٌ।

অর্থ; জমা করা, মিলিয়ে রাখা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾

অর্থ: এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব। অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।[৫]

২. এটি قَرَأَ থেকে নির্গত কোন শব্দ নয়। বরং গায়রে মাহমুযুল আসল। আল্লাহ তাআলা রাসূলের কাছে এটিকে আলম বা নির্দিষ্ট নাম হিসেবেই প্রেরণ করেছেন।

এটি হয়ত قَرْنٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ মিলানো। কুরআনের একটি আয়াত অন্য আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা হয়।

অথবা اَلْقَرَائِنُ থেকে নির্গত, যার অর্থ একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাদৃশ্যপূর্ণ।

মুফাসসিরীনে কেরাম প্রথম মতটিকেই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য ও দ্বিতীয় মতটিকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

---

৫. সূরা কিয়ামাহ, ১৭-১৮

পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

কুরআনের পারিভাষিক অর্থ প্রকাশ করা মানুষের ক্ষমতাধীন বিষয় নয়। কেননা, কুরআনের লফয ও মাআনী (শব্দ ও অর্থ) উভয়টিই মুজেযা। তাই এর পরিচয় ও সংজ্ঞা ব্যক্ত করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে মুফাসসিরীনে কেরাম সান্ত্বনামূলক কিছু পরিচয় তুলে ধরেছেন।

১. هُوَ مَا بين هَاتَيْنِ الدَّفَّتَيْنِ

অর্থ: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গিলাফের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তাকেই কুরআন বলে।

২. هُوَ مِنْ بسم الله الرحمن الرحيم إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ

অর্থ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম থেকে কুরআনের শেষ অংশ (সূরা নাস) পর্যন্ত পুরোটার নাম কুরআন।

৩. এক্ষেত্রে সবচেয়ে জামে-মানে পরিচয় হল সেটি, যা আল্লামা নাসাফি রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মানার" এ উল্লেখ্য করেছেন। তা হল-

هُوَ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُوْلِ الْمَكْتُوْبِ فِيْ الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُوْلِ إِلَيْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ

অর্থ: আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে এবং মাসহাফে যা লিখিত আছে ও আমাদের পর্যন্ত কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়া মুতাওয়াতের সূত্রে যা বর্ণিত হয়ে এসেছে সেটিই হল কুরআন।

নামকরণের কারণসমূহ:

উল্লিখিত কুরআনের প্রথম শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী কুরআনকে কুরআন বলা হয় এজন্য যে, কুরআনই হল পৃথিবীর সবচে' অধিক পঠিত গ্রন্থ।

আর দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে কুরআনকে কুরআন বলার কারণ হল, কুরআনে পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থের ইলম রয়েছে; বরং পৃথিবীর সকল ইলম জমা করা হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। অথবা কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের সাদৃশ্যপূর্ণ। এ হিসেবেই কুরআনকে "কুরআন" নামে নামকরণ করা হয়েছে।

বিশ্বনন্দিত আলেমে দ্বীন প্রখ্যাত ফকীহ শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতী তাকি উসমানী হাফি. কুরআনকে কুরআন বলে নামকরণ করার কারণ সম্পর্কে উলূমুল কুরআনে লিখেছেন, "আমার কাছে এ ক্ষেত্রে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়, কিতাবুল্লাহকে কুরআন নামে নামকরণ করা হয়েছে মক্কার কাফেরদেরকে জওয়াব দেওয়ার জন্য। কারণ, তারা পরস্পরে বলাবলি করত,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۝

অর্থ: তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করতে যেওনা; বরং কুরআন তেলাওয়াতের সময় তোমরা অহেতুক কথাবার্তা বলতে থাক।[৬]

তাদের নাম দিয়েই নামকরণ করে তাদেরকে কঠিন জওয়াব দেওয়া হয়েছে এবং এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, তাদের অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রের কারণে কুরআনের দাওয়াত কখনো থেমে যাবে না; বরং কিয়ামত পর্যন্ত তা জারি থাকবে। বর্তমানে এটাই বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পঠিত কিতাবের নাম হল আল-কুরআন"।[৭]

কুরআনের নামসমূহ:

কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি নাম পাওয়া যায়,

১. "اَلْقُرْاٰن" আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۝[৮]

---

৬. সূরা হামীম সেজদা, ২৬
৭. উলুমুল কুরআন, ২৪
৮. সূরা ইসরা- ৯

২. "اَلْفُرْقَانُ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

تَبٰرَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِهٖ لِیَكُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۙ﴿۱﴾ [৯]

৩. "اَلْكِتَابُ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ كِتٰبًا فِیْهِ ذِكْرُكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰﴾ [১০]

৪. "اَلذِّكْرُ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿۹﴾ [১১]

৫. "اَلتَّنْزِيْلُ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِیْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۹۲﴾ؕ [১২]

কুরআনের গুণবাচক নামসমূহ:

কুরআনে বর্ণিত গুণবাচক নাম প্রচুর পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ কিছু গুণবাচক নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল:

১. "النور" আল্লাহ তাআলা বলেন,

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكُمْ نُوْرًا مُّبِیْنًا ﴿۱۷۴﴾ [১৩]

২. "هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ ۙ۬ وَ هُدًی وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۵۷﴾ [১৪]

---

৯. সূরা ফুরকান- ১
১০. সূরা আম্বিয়া-১০
১১. সূরা হিজর- ৯
১২. সূরা শুআরা- ১৯২
১৩. সূরা নিসা- ১৭৪
১৪. সূরা ইউনুস- ৫৭

৩. "مُبَارَكٌ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِیْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰی وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ یُحَافِظُوْنَ ۞[১৫]

৪. "مُبِينٌ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

یٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِیْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَیَعْفُوْا عَنْ كَثِیْرٍ ۬ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِیْنٌ ۞[১৬]

৫. "بُشْرَى" আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِیْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَهُدًی وَّبُشْرٰی لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۞[১৭]

৬. "عَزِيزٌ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِیْزٌ ۞[১৮]

৭. "مَجِيْدٌ" আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِیْدٌ ۞ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۞[১৯]

৮. "بَشِيرًا وَنَذِيرًا" আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُوْنَ ۞ بَشِیْرًا وَّنَذِیْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُوْنَ ۞[২০]

---

১৫. সূরা আনআম-৯২
১৬. সূরা মায়িদা-১৫
১৭. সূরা বাকারা-৯৭
১৮. সূরা ফুসসিলাত-৪১
১৯. সূরা বুরুজ-২১
২০. সূরা ফুসসিলাত: ৩-৪

বি. দ্র. কুরআনের নাম ও গুণবাচক নাম প্রত্যেকটিই কুরআনের অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং কুরআনের প্রতিটি নামই অর্থবোধক। অর্থবিহীন নয়।[২১]

কুরআন ও হাদীসে কুদসির মাঝে পার্থক্য:

কুরআনের পরিচয় আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি। এখন আমরা হাদীসে কুদসির পরিচয় জেনে নেব। যাতে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য বুঝতে সহজ হয়।

হাদীসে কুদসির পরিচয়:

"কুদসী" শব্দটিকে নিসবত করা হয়েছে কুদস-এর দিকে। যার অর্থ হল, পূত-পবিত্র। উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা। কেননা, আল্লাহ তাআলার যাত তথা সত্তা পাক-পবিত্র।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, হাদীসে কুদসী বলা হয় ঐ কালামকে, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত করেন; তথা যে কালাম রাসূল বর্ণনা করেন এ কথা বলে যে, এটা আল্লাহ তাআলার কালাম। সহজ ভাষায় বলা যায়, আল্লাহ তাআলার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজ ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করার নামই হল হাদীসে কুদসী।

যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি খরচ কর। আমি তোমার জন্য খরচ করব এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলার হাত পরিপূর্ণ। রাত-দিন অনবরত খরচেও তা কমবে না।[২২]

২১. আল ইতকান- ১১৪, মাবাহিস ফী উলুমিল কুরআন- ১৪-১৮, উলুমুল কুরআন- ২৩

২২. সহীহ বুখারী-৪৬৮৪

এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যসমূহ:

কুরআন ও হাদীসে কুদসীর মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পার্থক্য তুলে ধরছি।

১. কুরআন আল্লাহর কালাম, আল্লাহর লফজ। লফজ ও মা'আনা উভয়টি মুজিযা। আহলে মক্কা চ্যালেঞ্জ করেও কুরআনের মত আরেকটি বাণী প্রণয়ন করে দেখাতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু হাদীসে কুদসী এমন নয়। হাদীসে কুদসীর লফজ মুজিযা নয়।

২. কুরআনের লফজ ও মা'আনা উভয়টির আল্লাহ তাআলার। কিন্তু হাদীসে কুদসীর লফজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের।

৩. কুরআনকে সরাসরি আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদসী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে নিসবত করা হয়।

৪. কুরআনে কারীমের পুরোটাই আমাদের পর্যন্ত মুতাওয়াতের সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে। আর হাদীসে কুদসী অধিকাংশই খবরে ওয়াহাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে।

৫. কুরআন পাঠ করা ইবাদত। এর দ্বারা নামায আদায় হয়। প্রত্যেক হরফ পাঠে দশ নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীসে কুদসী পাঠ করলে নামায আদায় হবে না। প্রত্যেক হরফ পাঠে দশ নেকী পাওয়া যাবে না। যাদিও তা পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাকে নেকী দান করবেন।

কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. এটি একটি মুজেযাপূর্ণ গ্রন্থ।

২. এটি তেলাওয়াত করা ইবাদত।

৩. এটি আমাদের নিকট অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

৪. কুরআনকে কুরআনের লফজ অনুযায়ী-ই আদায় করতে হবে।

৫. প্রত্যেক হরফ পাঠে দশ নেকী পাওয়া যায়।

'ওহী' এর শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

'ওহী' এর শাব্দিকবিশ্লেষণ:

ওহী শব্দটি মাসদারে ইসমি। أَوْحَىٰ - يُوْحِيْ - إِيْحَاءً থেকে নির্গত। অর্থ হল, কারও অগোচরে কোন কথা বলা। দ্রুত ইশারা করা ইত্যাদি।

ওহী শব্দের পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে করেন, অন্ধকার থেকে আলোর পথের দিশা দেওয়ার জন্য নির্বাচন করেন। তো তাদের হেদায়েতের জন্য যে বার্তা প্রেরণ করেন, সেটিকেই ওহী বলা হয়।

ওহীর প্রকারভেদ:

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. ফায়জুল বারীতে উল্লেখ করেছেন যে, ওহী তিন প্রকার,

১. ওহীয়ে কালবী। এ প্রকার ওহী কোন মাধ্যমে অবতীর্ণ হয় না; বরং আম্বিয়ায়ে কেরামের অন্তরে জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঢেলে দেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সুনিশ্চিত হন যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত ওহী।

২. ওহীয়ে ইলাহী। এ প্রকার ওহীও কোন মাধ্যমে অবতীর্ণ হবে না; বরং আল্লাহ তাআলা সরাসরি নির্বাচিত পয়গাম্বরকে প্রদান করেন। মানবীয় শক্তিতে এটি সম্ভব নয়।

৩. ওহীয়ে মালাকী। এ প্রকার ওহী ফেরেশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। কখনো ফেরেশতা মানবাকৃতিতে ওহী নিয়ে আগমন করেন। কখনো-বা অদৃশ্য থেকে শুধুমাত্র আওয়াযের মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যেভাবে ওহী আসত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মোট ছয়টি পদ্ধতিতে ওহী অবতীর্ণ হত-

১. "صَلْصَلَةُ الْجَرَسْ" ওহী নাযিল হওয়ার সময় ঘন্টা বাজার মত একটি আওয়াজ হত। ফেরেশতা অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী প্রেরণ করতেন। হাদীসের ভাষ্য মতে এ পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হওয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সবচে' বেশি কষ্টকর ছিল।

২. "تَمَثُّلُ مِلْكٍ" ফেরেশতা কোন মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে ওহী অবতীর্ণ করে যেতেন। অধিকাংশ সময় জিবরীল আ. প্রসিদ্ধ সাহাবী দাহিয়্যাতুল কালবীর রূপে রাসূলের নিকট আগমন করতেন। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, দাহিয়্যাতুল কালবীকে নির্বাচন করার কারণ হল, তখনকার সময় তিনি সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। অবশ্য জিবরীল আ. কখনো অপরিচিত ব্যক্তির মত তাশরীফ নিতেন। যেমনটি আমরা হযরত ওমর রাযি.-এর হাদীসে জিবরীলে জানতে পারি।

এ দুই পদ্ধতিতে ওহী নাযিল হওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ﷺ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﷺ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحْيَانًا يَأْتِيِنِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ:

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

অর্থ: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হারিস ইবনে হিশাম রাযি. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার নিকট ওহী কীরূপে আসে?' আল্লাহর রাসল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো কোনো সময় তা ঘন্টা বাজার মত আমার নিকট আসে। আর এটিই আমার জন্য সবচেয়ে কষ্টকর মনে হয় এবং তা শেষ হতেই ফেরেশতা যা বলেন, তা আমি মুখস্থ করে নেই। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই। ' আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি তীব্র শীতের সময় ওহী নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর ললাট হতে ঘাম ঝরে পড়তো।[২৩]

৩. "إِتْيَانُ الْمَلَكِ فِيْ هَيْئَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ" মানুষের আকৃতি ধারণ করে নয়, বরং জিবরীল আ. তাঁর নিজ আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ওহী অবতীর্ণ করে যেতেন। এমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে তিনবার ঘটেছে। প্রথমবার যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরীল আ. কে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। দ্বিতীয়বার মেরাজের সময়। তৃতীয়বার নবুওয়ত লাভ করার পূর্বে মক্কার আজইয়াদ নামক স্থানে।

৪. "الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ" ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য স্বপ্ন দেখতেন। নবীদের স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাদুর ঘটনা স্বপ্নেই দেখানো হয়েছিল এবং স্বপ্নেই এর প্রতিষেধক আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলে দিয়েছিলেন।

---

২৩. বুখারী, হাদীস নং: ২

৫. "النَّفْثُ فِيْ الرَّوْعِ" কোন রকম আকৃতি ধারণ না করে জিবরীল আ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে ওহী দিয়ে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رَوْعِيْ

অর্থ: পবিত্র আত্মা তথা জিবরীল আ. আমার অন্তরে ওহী অবতীর্ণ করেছেন।[২৪]

৬. "كَلَامٌ إِلَاهِيٌّ" আল্লাহ তাআলা সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁর নির্বাচিত পয়গাম্বরকে ওহী প্রদান করেন। মানবীয় শক্তিতে এটি সম্ভব নয়। বরং আল্লাহ তাআলা বিশেষ শক্তির মাধ্যমে বিশেষ নবীকে এ মর্যাদা দান করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ.-এর সাথে তুর পাহাড়ে সরাসরি সাক্ষাতের মাধ্যমে ওহী প্রেরণ করেন।

অনুরূপভাবে মেরাজের রজনীতে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেন।[২৫]

২৪. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-৩৫৪৭৩, মুসান্নাফে আব্দির রাজ্জাক-২০১০০, মুসনাদে বাযযার-২৯১৪, মাজমায়ুয যাওয়ায়িদ-৬২৮৭

২৫. আল ইতকান-১০৩, মাবাহিছ ফী উলুমিল কুরআন-৩১, উলুমুল কুরআন-২৩

কুরআন পার্ট-২

এ অধ্যায়ে রয়েছে–

✓ লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে
✓ কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস
✓ সাত হরফে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যা
✓ মাক্কী মাদানী আয়াতের পরিচয় ও আলামত ও বৈশিষ্ট্যসমূহ

লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ ؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۝۱۸۵

অর্থ: "রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না; যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।"[২৬]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝۱

অর্থ: আমি এ কুরআনকে লায়লাতুল কদরে অবতীর্ণ করেছি।[২৭]

---

২৬. সূরা বাকারা-১৮৫

২৭. সূরা ক্বদর- ১

এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে রমজান মাসে নাযিল করেছেন এবং এ মাসের লায়লাতুল কদরে নাযিল করেছেন।

লাওহে মাহফুজ থেকে কুরআনে কারীম কীভাবে নাযিল হয়েছে এ নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

১. এটাই বিশুদ্ধ মত। আল্লাহ তাআলা লায়লাতুল কদরে একসাথে পুরো কুরআন প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের যামানায় একের পর এক ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে:

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِيْ قَوْلِه تَعَالٰى ﴿اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ۝﴾ قَالَ أَنْزَلَ الْقُرْآنَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَكَانَ بِمَوْقِعِ النُّجُوْمِ وَكَانَ اللهُ يَنْزِلُهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْضَه فِيْ أَثَرِ بَعْضٍ.

অর্থ : "হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তাআলা লায়লাতুল কদরে একসাথে পুরো কুরআন প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী নবুওয়তের যামানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন।"[২৮]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ।[২৯]

২. আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের জীবনীতে প্রত্যেক বছর লায়লাতুল কদরে একসাথে এক বছরের কুরআন প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর

২৮. মুসতাদরাকে হাকেম-২/২২২, সুনানে বায়হাকী-২/৩১০
২৯. ইতকান-৯৪

প্রয়োজন অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সে বছর একের পর এক ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন।

এটি নিয়ে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযী রহ. দীর্ঘ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, হয়ত আল্লাহ পাক মানব সম্প্রদায়ের পরবর্তী এক বছর যতটুকু প্রয়োজন হবে ততটুকুই প্রত্যেক বছর লায়লাতুল কদরে একসাথে এক বছরের কুরআন প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেন।

আল্লামা ইবনে কাছির রহ. বলেন, এ মতটি আল্লামা কুরতুবী রহ. মুকাতিল ইবনে হায়্যানের বরাতে উল্লেখ করেন।

৩. আল্লামা শা'বী রহ. বলেন, আল্লাহ পাক লায়লাতুল কদরে কুরআন প্রথম আসমানে নাযিল করার সূচনা করেছেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুযায়ী বিক্ষিপ্ত সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে পুরো নবুওয়তের জীবনীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একের পর এক ধারাবাহিকভাবে নাযিল করেন ।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, প্রথম মতটিই সহীহ ও গ্রহণযোগ্য।[৩০]

কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাসঃ

কুরআন সংরক্ষণের পাচঁটি স্তর রয়েছে,

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন সংরক্ষণ।

২. আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ।

৩. উসমান রাযি.-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ।

৪. আজমীদের তেলাওয়াত সহজ করণ পদ্ধতি।

৫. কুরআন কাগজের পাতায় মুদ্রিত হয়ে আসা।

---

৩০. আল বুরহান-১৬০, আল ইতকান-৯৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন সংরক্ষণ যেমন ছিল:

আমরা এখানে কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস দু'ভাগে বিভক্ত করছি,

- মুখস্থ করার মাধ্যমে সিনায় কুরআন সংরক্ষণ।
- লিখিত আকারে কুরআন সংরক্ষণ।

(১) সিনায় কুরআন সংরক্ষণ:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কুরআনকে সিনায় সংরক্ষণ করেন। কেননা, তিনি জিবরীল আ. থেকে ওহী সংরক্ষণ করে তা মুখস্থ করে সিনা মোবারকে ধারণ করতেন। বলাবাহুল্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আগ্রহের সাথে ওহী আসার অপেক্ষা করতেন।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো কোনো সময় ওহী ঘন্টা বাজার মত আমার নিকট আসে। আর এটিই আমার উপর সবচেয়ে কষ্টদায়ক এবং তা শেষ হতেই ফেরেশতা যা বলেন তা আমি মুখস্থ করে নিই।[৩১]

সুতরাং বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন কুরআনকে সিনায় প্রথম ধারণকারী। তিনি ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় তেলাওয়াতের পুনরাবৃত্তি করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীকে কুরআন মুখস্থ করত সংরক্ষণের আদেশ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হুফ্ফাজে কুরআন নামে সাত'জন প্রসিদ্ধ হন। তারা হলেন,

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.
২. সালেম ইবনে মা'কাল মাওলা আবু হুযাইফা রা.
৩. মুআজ ইবনে জাবাল রা.
৪. উবাই ইবনে কা'ব রাযি.

---

৩১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২

৫. যায়েদ ইবনে সাবেত রা.

৬. আবু যায়েদ ইবনে সাকান রা.

৭. আবু দারদা রা.

ইমাম বুখারী রহ. তিনটি রেওয়াতের মাধ্যমে এ সাতজন হুফ্ফাজে কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন।

আমি এখানে বুখারী শরীফের তিনটি রেওয়ায়েত ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি।

১. মাসরূক রহ. থেকে বর্ণিত,

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرٍو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِيْ حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

অর্থ: "আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল আ'স বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ কর; 'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাযি., সালিম রাযি., মু'আয রাযি. এবং উবাই ইবনে কা'ব রাযি.।"[৩২]

কাতাদা রহ. থেকে বর্ণিত,

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ أَبُوْ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لِأَنَسٍ مَنْ أَبُوْ زَيْدٍ قَالَ: أَحَدُ عُمُوْمَتِيْ.

অর্থ: "হযরত কাতাদা রহ. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় কুরআন সংগ্রহ করেছেন মোট চারজন সাহাবী এবং তাঁরা চারজনই ছিলেন আনসার সাহাবী। তাঁরা হলেন, উবাই ইবনে কা'ব

৩২. বুখারী-৪৯৯৯

রাযি.,মুআয ইবনে জাবাল রাযি., যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. এবং আবু যায়দ রাযি.।"[৩৩]

২. সাবেত রহ. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَ أَبُوْ زَيْدٍ.

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেকরাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইন্তিকাল করলেন তখন চারজন সাহাবী ব্যতীত আর কেউ কুরআন সংরক্ষণ করেননি। তাঁরা হলেন আবু দারদা রা.,মুআয ইবনে জাবাল রা., যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. এবং আবু যায়দ রাযি.।[৩৪]

এ তিন সনদে ইমাম বুখারী রহ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালের সাতজন হুফফাজে হাদীসের নাম উল্লেখ করেছেন।

(২) লিখিত আকারে কুরআন সংরক্ষণে পদ্ধতি:

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু জালিলুল কদর সাহাবীকে কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। যাদেরকে কাতেবে ওহী বলা হত। তিনি তাদেরকে কুরআনের কোন আয়াত কোথায় রাখবে, কোন সূরা কোথায় থাকবে এসব বলে দিতেন এবং তারা সে হিসেবে গাছের পাতা কিংবা পশুর চামড়ার মধ্যে লিখে রাখতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে যারা কাতেবে ওহী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন তারা হলেন:

১. যায়দ ইব্‌নে সাবিত রাযি.
২. মুয়াবিয়া রাযি.
৩. উবাই ইবন কা'ব রাযি.
৪. ইয়া'লা প্রমুখ

৩৩. বুখারী-৫০০৩
৩৪. বুখারী-৫০০৪

হযরত যায়দ ইব্‌নে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُؤَلِّفُ القرآنَ مِنَ الرِّقَاعِ.

অর্থ: আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে গাছের পাতা বা চামড়ার উপর কুরআন লিখে রাখতাম।[৩৫]

এ থেকে খুব সহজেই অনুভব করা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. কুরআন সংরক্ষণের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন। তাদের কাছে লেখার স্বাভাবিক যন্ত্র তথা কলম,কাগজ ইত্যাদি ছিল না। গাছের পাতা, পশুর চামড়া ইত্যাদিতেই লিখে সংরক্ষণ করে রাখতে হত।

প্রতি রমজানে হযরত জিবরীল আমীন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কুরআন তাকরার করতেন। (যেমনটা বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে) তখন সাহাবায়ে কেরামও তাদের কাছে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত কুরআনের নুসখা পেশ করতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে কুরআন নির্দিষ্ট কোন মাসহাফে লিখিত ছিল না; বরং বিক্ষিপ্তভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।

সারাংশ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম সাহাবায়ে কেরামের সিনায় সংরক্ষিত ছিল এবং বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত ছিল। নির্দিষ্ট কোন মাসহাফে লিখিত ছিল না।

আবু বকর রাযি.-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ যেমন ছিল:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবু বকর রাযি.-এর কাধে ইসলামী খেলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তখন আরবের কিছু লোক মুরতাদ হতে শুরু করল। আবু বকর রাযি. তাদের

৩৫. মুসতাদরাকে হাকেম-২৯০১

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এ সূত্রেই তাদের বিরুদ্ধে বারো হিজরীতে জঙ্গে ইয়ামামা সংঘঠিত হয়।

এ যুদ্ধে অনেক সাহাবী শাহাদাতবরণ করেন। বিশেষ করে মোট সত্তরজন কারী সাহাবী শহীদ হন। ফলে বিষয়টি আবু বকর ও ওমর রাযি.-সহ গুরুত্বপূর্ণ সাহাবীদের হৃদয়ে নাড়া দেয় এবং আশঙ্কাবোধ করেন। বাকি কারী সাহাবীগণ যদি এভাবে চলে যান, তাহলে কুরআনের আয়াত, সূরা ইত্যাদি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

তাই হযরত ওমর রাযি. আবু বকর রাযি.-এর স্মরণাপন্ন হন এবং তাঁর আশঙ্কার কথা জানান। আর প্রসিদ্ধ কারী সাহাবীদেরকে দিয়ে কুরআন মাসহাফে লিপিবদ্ধ করে রাখার পরামর্শ দেন।

আবু বকর রাযি. প্রথমে অনাগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, যে কাজটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেননি তা আমি কোন সাহসে করতে যাব!

ওমর রাযি. বার বার পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা আবু বকর রাযি.-এর অন্তরকে কুরআন লিপিবদ্ধ করার রহস্য উন্মোচন করে দিলেন।

অতঃপর আবু বকর রাযি. কাতেবে ওহী যায়েদ বিন সাবেত রাযি.-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের ইচ্ছার কথা জানালেন। প্রথমে তিনিও অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। যেমনটি আবু বকর রাযি. প্রথমে করেছিলেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তার বক্ষকেও উন্মোচন করে দিলেন। তিনি নির্দিষ্ট মাসহাফে জমা করতে রাজী হয়ে যান।

পুরো ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ قَالَ: أَرْسَل إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ؛ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﵁ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِيْ فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّيْ أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ

بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللهُ صَدْرِيْ لِذَالِكَ وَرَأَيْتُ فِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ رَأٰى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتْهَمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُوْنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللهِ؟ قَالَ هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُوْ بَكْرٍ يُرَاجِعُنِيْ حَتّٰى شَرَحَ اللهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُ آخِرَ سُوْرَةَ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِيْ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيْ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾

حَتّٰى خَاتِمَةَ بَرَاءَةٍ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِيْ بَكْرٍ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رضي الله عنهما

অর্থ: হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহীদ হওয়ার পর আবু বকর সিদ্দীক রাযি. আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় ওমর রা.ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর রাযি. বললেন, ওমর রাযি. আমার কাছে এসে বললেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কুরআন মাজীদের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি মনে করি, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি ওমর রাযি.-কে বললাম, যে কাজ আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেননি সে কাজ তুমি কীভাবে করবে? ওমর রাযি. জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটি উত্তম কাজ।

ওমর রাযি. এ কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে ওমর রাযি. যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায়েদ রাযি. বলেন, আবু বকর সিদ্দীক রাযি. আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। তদুপরি তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন মাজীদের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্রিত কর। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পর্বত এক স্থান হতে অন্যত্রে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, আপনারা সে কাজ কীভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বকর সিদ্দীক রাযি. আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ আমার বক্ষকে উন্মোচন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর এবং ওমর রাযি.-এর বক্ষকে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখণ্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা আনসারী রাযি. থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ছাড়া আর কারও কাছে আমি পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে এই,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ * فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

"তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছেন। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তাঁর জন্য তা কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। এরপর তারা

যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাআরশের অধিপতি। (১২৮-১২৯)"

তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর রাযি.-এর কাছে রক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুও পর তা ওমর রাযি.-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। অতঃপর তা ওমর রাযি.-এর কন্যা হাফসাহ রাযি.-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল।[৩৬]

হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি. কোন কিছু লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি শুধুমাত্র সিনায় সংরক্ষণের উপর নির্ভর করতেন না; বরং রাসূলের সময়কালে লিখে রাখা নুসখার সাথে তা মিলিয়ে নিতেন।

কুররায়ে সাহাবা বা কাতেবে ওহীদের কাছ থেকে কুরআনের আয়াত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁর সর্তকতা অবলম্বনের দৃষ্টান্তঃ

১. নিজের হিফজের সাথে মিলিয়ে নিতেন।
২. কেউ কুরআনের আয়াত নিয়ে আসলে যাচাই-বাচাই করে হযরত ওমর ও যায়েদ বিন সাবেত রাযি.-এর হিফজের সাথে সম্মিলিতভাবে মিলিয়ে নিতেন।
৩. নির্ভরযোগ্য দুজন সাক্ষী ছাড়া কোন আয়াত গ্রহণ করতেন না।
৪. লিখিত আয়াত, সূরাসমূহকে সাহাবায়ে কেরামের হিফজের সাথে মিলিয়ে নিতেন। অর্থাৎ, লিখিত নুসখা হিফজের সাথে মিললেই কেবল তা গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু শামাহ বলেন, যায়েদ বিন সাবেত রাযি. এসব শর্ত জুড়ে দিয়েছেন যাতে কুরআন লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা যায়। যায়েদ বিন সাবেত রাযি. হিফজ থেকে ঐ সমস্ত

---

৩৬. সহীহ বুখারী-৪৯৮৬

আয়াতকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে লিখা হয়েছে।[৩৭]

যায়েদ বিন সাবেত রাযি.-এর মাসহাফের বৈশিষ্ট্য:

যায়েদ বিন সাবেত রাযি. সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে কাগজের পৃষ্ঠায় কুরআন সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু সূরাসমূহ আলাদা পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা ছিল। তাই এ নুসখা বহুপৃষ্ঠা সম্বলিত ছিল। পরিভাষায় এ নুসখাকে "আল উম্ম" বলা হয়।

"আল উম্ম" নুসখার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. এ নুসখায় কুরআনের আয়াতসমূহকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে যাওয়া বিন্যাস অনুযায়ী-ই সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু সূরাসমূহ সুবিন্যস্ত ছিল না; বরং প্রত্যেকটি সূরা পৃথক পৃথক পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ছিল।

২. এ নুসখায় সাত কেরাতের রেওয়ায়েত একসাথে জমা করা হয়েছে।

৩. এ নুসখাটি "হায়রী" খতে লিখা হয়েছে।

৪. এ নুসখায় কেবল ঐ সমস্ত আয়াতই স্থান পেয়েছে, যেগুলোর তেলাওয়াত রহিত হয়নি।

৫. এ নুসখা তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে একটি মাসহাফ তৈরি করা। যাতে প্রয়োজনের সময় সকল মানুষ এ নুসখার দিকে রুজু করতে পারে।

বি. দ্র. এ নুসখাটি হযরত আবু বকর রাযি.-এর পর হযরত ওমর রাযি.-এর কাছে ছিল। অতঃপর ওমর রাযি.-এর মৃত্যুর পর তা হাফসা রাযি.-এর কাছে ছিল।

উলামায়ে কেরাম মনে করেন, কুরআনকে মাসহাফ বলা শুরু হয় হযরত আবু বকর রাযি.-এর সময়কাল থেকেই। কেননা তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনকে নির্দিষ্ট মাসহাফে লিপিবদ্ধ করেন।

৩৭. ইতকান-১/৬০

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِيْ الْمَصَاحِفِ أَبُوْبَكْرٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ.

অর্থ: কুরআনকে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে সবচে' বেশি সাওয়াব পাবে আবু বকর রাযি.। কারণ, তিনিই সর্বপ্রথম কুরআন জমা করেন।[৩৮]

উসমান রাযি.-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণ যেমন ছিল:

হযরত উসমান রাযি.-এর খেলাফতের সময়কালে রাজ্য বিস্তার হয়। উসমানের সময়েই তা আরব এলাকা তথা ইরাক, সিরীয়া, মিশর, ছাড়িয়ে অনারব রাজ্য যেমন, ইরান, তুরস্ক ইসালামী খেলাফতের আওতায় আসে। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি, বর্ণ ও ধর্মের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে কুরআনের কারীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েন। কারীগণ সবাই যে কুরাইশদের আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন মুখস্থ করেছিলেন বিষয়টি সে রকম নয়; বরং প্রত্যেকেই যার যার অঞ্চলের উচ্চারণরীতি অনুযায়ী কুরআন মুখস্থ করেছেন। প্রত্যেকেই সাত কেরাতের মধ্যে তার এলাকায় প্রচলিত কেরাতে কুরআন শিখেছেন।

অনারবীদের অনেকেই মুসলিম মুজাহিদ বা ব্যবসায়ীদের থেকে কুরআন শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ফলে অনারবীদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। একজন আরেকজনের কেরাত ভুল বলে আখ্যা দিত। এমনকি এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে একে অপরকে কাফেরও ফতোয়া দিত। যদিও সাত কেরাত অনুযায়ী তাদের সব কেরাতই সহীহ।

আরমিনিয়া ও আযারবাইজান যুদ্ধের সময় হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. বিষয়টি খেয়াল করলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, আজমিরা কেরাত নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। বিষয়টি তাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলল। ফলে তিনি কিতাব সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত উম্মতে মুহাম্মাদীও মত-পার্থক্যে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করলেন।

---

৩৮. আল-মাসাহিফ লি আবি দাউদ-১৫৪

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. বিষয়টি হযরত উসমান রাযি.-কে অবহিত করলেন এবং সম্ভাব্য আশঙ্কা সম্পর্কে সর্তক করে বললেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, কিতাব সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত মত-পার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এ উম্মতকে আপনি রক্ষা করুন"।

বিষয়টি সম্পর্কে হযরত উসমান রাযি. ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর সাথে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তিনি কুরআনকে এক কেরাতের উপর জমা করবেন। আর সেটি হবে লুগাতে কুরাইশের কেরাত। কেননা, কুরআন নাযিল হয়েছে কুরাইশ ভাষায়ই।

তারপর উসামান রাযি. হাফসা রাযি.-এর কাছে এ বলে একজন দূত পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত হযরত আবু বকর রাযি.-এর সময়কালে লিপিবদ্ধ কুরআনের সহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

হাফসা রাযি. তখন সেগুলো হযরত উসমান রাযি.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

অতঃপর উসমান রাযি. চারজন সাহাবীকে এক কেরাতে কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা হলেন:

১. যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি.

২. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.

৩. সাঈদ ইবনে আস রাযি.

৪. আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রাযি.

চারজনের মধ্যে কেবলমাত্র যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. ছিলেন আনসারী সাহাবী। বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। হযরত উসমান রাযি. কুরাইশী তিন সাহাবীকে বললেন, তোমাদের কুরআনের কোন অংশ যদি হযরত যায়েদের কুরআনের কোন অংশের বিপরীত দেখা দেয়, তাহলে তোমরা কুরাইশ ভাষায়-ই কুরআন লিখবে। কেননা, কুরআন নাযিল হয়েছে কুরাইশ ভাষায়।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلٰى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِيْ أَهْلَ الشَّامِ فِيْ فَتْحِ إِرْمِيْنِيَةَ وَأَذْرَبَيْجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةُ اِخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَدْرِكْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوْا فِيْ الْكِتَابِ اِخْتِلَافَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلٰى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِيْ إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِيْ الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلٰى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وِعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِيْ الْمَصَاحِفِ.

وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَيْشِيِّيْنَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اِخْتَلَفْتُمْ أُنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ. فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَافْعَلُوْا حَتّٰى إِذَا نَسَخُوْا الصُّحُفَ فِيْ الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلٰى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلٰى كُلِّ أُفُقٍ بِمَصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوْا وَ أَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِيْ كُلِّ صَحِيْفَةٍ أَوْ مَصْحَفٍ أَنْ يُحْرِقَ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَخْبَرَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدَتْ آيَة مِنَ الْأَحْزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمَصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ {مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْا اللهَ عَلَيْهِ}. فَأَلْحَقْنَاهَا فِيْ سُوْرَتِهَا فِي الْمَصْحَفِ.

অর্থ: আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রাযি. একবার উসমান রাযি.-এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আরমিনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের ব্যাপারে সিরীয় ও ইরাকী যোদ্ধাদের জন্য রণ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে তাঁদের মতবিরোধ হুযায়ফাকে ভীষণ চিন্তিত করল। সুতরাং তিনি উসমান রাযি.-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, কিতাব সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারাদের মত মত-পার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার

পূর্বে এ উম্মতকে রক্ষা করুন। তারপর উসমান রাযি. হাফসা রাযি.-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন যে, আপনার কাছে সংরক্ষিত কুরআনের সহীফাসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা সেগুলোকে পরিপূর্ণ মাসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করতে পারি। এরপর আমরা তা আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।

হাফসা রাযি. তখন সেগুলো উসমান রাযি.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর উসমান রাযি., যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি., আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি., সাঈদ ইবনে আস রাযি. এবং আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম রাযি.-কে নির্দেশ দিলেন। তাঁরা মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করলেন। এ সময় উসমান রাযি. তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, কুরআনের কোন বিষয়ে যদি যায়দ ইবনে সাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতপার্থক্য দেখা দেয়, তাহলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন। যখন মূল লিপিগুলো থেকে কয়েকটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়ে গেল, তখন উসমান রাযি. মূল লিপিগুলো হাফসা রাযি.-এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর তিনি কুরআনের লিখিত মাসহাফসমূহের এক একখানা মাসহাফ এক এক প্রদেশে পাঠিয়ে দিলেন এবং এতদ্ভিন্ন আলাদা আলাদা বা একত্রে সন্নিবেশিত কুরআনের যে কপিসমূহ রয়েছে তা জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ইবনে শিহাব রহ. খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিতের মাধ্যমে যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমরা যখন গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত আমার থেকে হারিয়ে যায়। অথচ আমি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠ করতে শুনেছি। তাই আমরা অনুসন্ধান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা তা খুযায়মা ইবনে সাবিত আনসারী রাযি.-এর কাছে পেলাম। আয়াতটি হচ্ছে-

"মু'মিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের কেউ কেউ শাহাদাতবরণ করেছে এবং কেউ কেউ

প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি”।[৩৯] তারপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরার সঙ্গে মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম।

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, উসমান রাযি. এক কেরাতের উপর কুরআন জমা করেন ২৫ হিজরীতে।[৪০] উসমান রাযি. এক কেরাতের উপর কুরআন জমা করেছেন সাহাবায়ে কেরামের ইজমার ভিত্তিতেই।

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

لَا تَقُوْلُوْا فِيْ عُثْمَانَ إِلَّا خَيْرًا فَوَاللهِ مَا فَعَلَ فِيْ الْمَصَاحِفِ إِلَّا عَنْ مَلَإٍ مِنَّا.

অর্থ: তোমরা উসমানের ব্যাপারে ভাল ধারণা কর। আল্লাহর কসম তিনি আমাদের সম্মতিতেই এক কেরাতের উপর কুরআন জমা করেছেন।

কুরআন সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ কে করেন?

আল্লামা হারেস মাহাসেবী বলেন, লোকমুখে প্রসিদ্ধ যে, কুরআন সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন হযরত উসমান রা.। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। কেননা, উসমান রাযি. তো ইরাক, শামবাসীদের কেরাতের মতবিরোধের কারণে ফেতনার আশংকায় এক কেরাতের উপর কুরআন জমা করেন।

হযরত আবু বকর রা.-ই হলেন কুরআনের প্রথম জমাকারী। তিনি ওমর রাযি.-এর পরামর্শে যায়েদ বিন সাবেত রাযি.-এর মাধ্যমে কুরআন জমা করার ব্যবস্থা করেন।

আবু বকর রাযি. ও উসমান রাযি.-এর কুরআন সংরক্ষণের মাঝে পার্থক্য

আবু বকর রাযি. ও উসমান রাযি. উভয়ের কুরআন সংরক্ষণের মাঝে বেশকিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করছি-

---

৩৯. সূরা আল-আহযাব ৩৩/২৩
৪০. ফাতহুল বারী ১০/১৫

১. উদ্দেশ্যগত পার্থক্য। উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন ছিল। হযরত আবু বকর রাযি.-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরআন বিলুপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করা। জঙ্গে ইয়ামামায় সত্তরজন কারী শাহাদাতবরণ করার পর হযরত আবু বকর ও ওমরসহ বিশিষ্ট সাহাবাগণের মাঝে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। হযরত ওমর রাযি.-এর পরামর্শে আবু বকর রাযি. তখন কুরআন জমা করেন। যাতে বাকি কারী সাহাবাগণ শাহাদাত বরণ করার মধ্যমে কুরআনের আয়াত ও সূরা বিলুপ্ত না হয়ে যায়।

আর উসমান রাযি.-এর জমা করার উদ্দেশ্য হল, ইরাক ও শামবাসীদের কেরাতের মতবিরোধের কারণে ফেতনার আশংকায় এক কেরাতের উপর কুরআন জমা করেন। যাতে উম্মতে মুহাম্মদী আহলে কিতাবদের মত আসমানীগ্রন্থ নিয়ে মতবিরোধ করে পথভ্রষ্ট না হয়ে যায়।

২. আবু বকর রাযি.-এর মাসহাফ সাত কেরাত সম্বলিত ছিল। আর উসমান রাযি.-এর মাসহাফ শুধুমাত্র এক কেরাত সম্বলিত ছিল। কারণ তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল উম্মতকে ইখতিলাফ থেকে বাঁচানোর জন্য এক কেরাতের উপর উম্মতকে আবদ্ধ করা।

৩. হযরত আবু বকর রাযি.-এর মাসহাফে সূরা সুবিন্যস্ত ছিল না; বরং পৃথক পৃথক কাগজে একেক সূরা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর উসমান রাযি.-এর মাসহাফে সুবিন্যস্তভাবে সূরাসমূহ জমা করা হয়েছে।

মাসহাফে উসমানির বৈশিষ্ট্যসমূহ

এ মাসহাফকে "মাসহাফে ইমাম" বলা হয়। নামটা হযরত উসমান রাযি.-এর বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছিলেন,

"يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ اِجْتَمِعُوْا فَاكْتُبُوْا لِلنَّاسِ إِمَامًا"

আল্লামা যুরকানী রহ. বলেন, মাসহাফে উসমানীতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য নুসখায় পাওয়া যায় না।

বৈশিষ্ট্যসমূহ হল-

১. এ মাসহাফে কেবল মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত নেওয়া হয়েছে। খবরে ওয়াহেদ এতে স্থান পায়নি।

২. যেসমস্ত আয়াতের তেলাওয়াত রহিত হয়েছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

৩. আয়াত ও সূরাসমূহকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমনটি আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি।

৪. কুরাইশী ভাষায় কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেননা কুরআন নাযিল হয়েছে কুরাইশী ভাষায়।

৫. শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ করেননি। যেমনটি কতক সাহাবী তাদের নুসখায় করেছেন।

৬. পুরো উম্মত ইজমা হয়েছে যে, মাসাহিফে উসমানীর পর অন্য কোন পদ্ধতিতে মাসহাফ লেখা যায়েজ নেই। এরপর থেকে সকল মাসহাফ লেখা হবে রসমে উসমানীর পদ্ধতিতে। সাহাবা, তাবেয়ীগণ রসমে উসমানী পদ্ধতিতে নকল করে পুরো পৃথিবীতে তা প্রচার-প্রসার করে দেন।

উসমান রাযি.-এর সময়ে লেখা মাসহাফের সংখ্যাঃ

উসমান রাযি.-এর সময়ে লিখা মাসহাফ যেগুলো তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এর সংখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি মত পাওয়া যায়। তা হল-

১. আবু আমর আদদানী রহ. বলেন, চারটি মাসহাফ উসমান রাযি. তৈরি করেছেন। তিনটি কুফা, বসরা ও শামে প্রেরণ করেছেন। আরেকটি ছিল মদীনার জন্য।[৪১]

---

৪১. আল বুরহান-১/৩৩৪

২. আল্লামা সুয়ূতী রহ. "আল ইতকান" এ লিখেছেন, প্রসিদ্ধ হল, পাঁচটি মাসহাফ উসমান রাযি. তৈরি করেছেন।

৩. ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, আমি আবু হাতেমকে বলতে শুনেছি, সাতটি মাসহাফ উসমান রাযি. তৈরি করেছেন।

আর এ সাতটি মাসহাফ প্রেরণ করেন, কুফা, বসরা, শাম, মদীনা, মক্কা, বাহরাইন ও ইয়ামানে।[৪২]

আল্লামা সুয়ূতী রহ. "আল ইতকান" এ লিখেছেন, দ্বিতীয় মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

আল্লামা যারকাশী রহ. বলেন, প্রথম মতটিই সহীহ। উলামায়ে কেরাম এ মতই গ্রহণ করেছেন।[৪৩]

তেলাওয়াত সহজকরণ পদ্ধতি:

উসমানী মাসহাফ নুকতা ও হারাকাতশূন্য ছিল। ইসলাম যখন পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অনেক আ'জমী মানুষ ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আসতে শুরু করল। ফলে নুকতা, হারাকাতশূন্য কুরআন তেলাওয়াত করা তখন তাদের জন্য কঠিন হয়ে গেল।

তাই উলামায়ে কেরাম আ'জমীদের তেলাওয়াত সহজকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তা হল, মাসহাফে উসমানীতে নুকতা ও হারাকাত দিয়ে তেলাওয়াত সহজ করলেন।

নুকতার প্রবর্তক কে ছিলেন?

প্রথমযুগে হরফে নুকতা ব্যবহার করা দোষণীয় ছিল। পত্র নুকতাসহ প্রেরণ করলে প্রাপক তা অপমানবোধ করত। তখনকার সময়ে নুকতাবিহীন লেখালেখির প্রচলন ছিল। পাঠক পূর্বাপর দেখে হরফের পার্থক্য করে নিত।

---

৪২. ইতকান-১৩২

৪৩. আল বুরহান-৩৩৪

ইতিহাসবিদ আল্লামা মাদায়েনী থেকে বর্ণিত:

"كَثْرَةُ النُّقْطِ فِيْ الْكِتَابِ سُوْءُ ظَنٍّ بِالْمَكْتُوْبِ إِلَيْهِ"

অর্থ: লেখার মধ্যে অতিরিক্ত নুকতা ব্যবহার করা প্রাপকের জন্য অপমানজনক।[৪৪]

কিন্তু পরবর্তীতে আ'জমী ও উম্মীদের তেলাওয়াত সহজ করার উদ্দেশ্যে নুকতার প্রচলন করা হয়। কিন্তু নুকতার আবিষ্কারক কে ছিল এ নিয়ে বেশ মতানৈক্য রয়েছে।

এ ব্যাপারে ছয়টি মত পাওয়া যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করছি,

১. কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, নুকতার প্রবর্তক ছিলেন আবুল আসওয়াদ দুওয়ালী।[৪৫]

২. কেউ কেউ বলেন, হযরত আলী রাযি.-এর তত্ত্বাবধানে নুকতার প্রবর্তন করা হয়।[৪৬]

৩. এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, কুফার গর্ভনর যিয়াদ বিন আবু সুফয়ান প্রবর্তন করেন।[৪৭]

৪. কতক বলেন, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের আদেশে নুকতার প্রবর্তন করা হয়।[৪৮]

৫. এক রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, খলীফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে হাসান বসরী, ইয়াহয়া বিন ইয়া'মার ও নাসর বিন আসেম কুরআনের নুকতার প্রবর্তন করেন।[৪৯]

৬. কারও কারও মতে, যিনি নুকতা অবিষ্কার করেন তিনিই সর্বপ্রথম কুরআনে সর্বপ্রথম নুকতার প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই মতটিকে

---

৪৪. সবহুল আ'শা-৩/১৫৪
৪৫. বুরহান, ২৫০-ইতকান, ১৭১
৪৬. সবহুল আ'শা-৩/১৫৫
৪৭. বুরহান-২৫০
৪৮. ইতকান-১৭১
৪৯. ইতকান-১৭১

"সবহুল আ'শায়" রদ করা হয়েছে। এ মত অনুযায়ী সর্বপ্রথম নুকতার আবিষ্কার করেন আমের বিন জাদারাহ।[৫০]

হরকতের প্রবর্তক কে ছিলেন?

নুকতার মত প্রথমযুগে হরকতেরও প্রচলন ছিল না। পাঠক বাক্যের পূর্বাপর দেখে হরকত পার্থক্য করে নিত।

হরকতের প্রবর্তক কে ছিল এ নিয়েও যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

১. কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় আবুল আসওয়াদ দুওয়ালী হরকতের প্রবর্তক ছিলেন।

২. অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে হাসান বসরী ও ইয়াহয়া বিন ইয়া'মার কুরআনের হরকতের প্রবর্তন করেন ।

আল্লামা তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ বলেন, সকল বর্ণনা সামনে রাখলে বুঝা যায়, সর্বপ্রথম হরকতের প্রবর্তক ছিলেন আবুল আসওয়াদ দুওয়ালী।[৫১]

কুরআন কাগজের পাতায় মুদ্রিত হয়ে আসা:

যখন পৃথিবীতে প্রেসের অস্তিত্ব ছিল না; তখন হাতে লিখেই কুরআন প্রচার করা হত। প্রত্যেক যুগেই একদল কাতেবে কুরআন থাকতেন যাদের দিনরাতের ব্যস্ততাই ছিল কেবল কুরআন লিপিবদ্ধ করা।

মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর সর্বপ্রথম জার্মানীর হামবুর্গ শহর থেকে হিজরী ১১১৩ সনে কোরআন শরীফ মুদ্রিত হয়। এ নুসখাটি আজ অবধি দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাতে সংরক্ষিত আছে।

এরপর থেকে অনেক প্রাচ্যবিদদের থেকে কুরআন মুদ্রিত হয়; কিন্তু মুসলিম জাহানের কাছে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।

৫০. সবহুল আ'শা-৩/১২
৫১. উলুমুল কুরআন-১৯৫

১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানীর সেন্টপিটাসবুর্গ শহরে মুসলিমদের মাঝে সর্বপ্রথম কোরআন মুদ্রিত করেন মাওলানা ওসমান।

অতঃপর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের তেহরান নামক শহরে কুরআন ছাপা হয় যা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরে।[৫২]

মাক্কী-মাদানী আয়াতের পরিচয়, আলামত ও বৈশিষ্ট্যঃ

আল্লামা বদরুদ্দিন যারকাশী রহ. বলেন, মাক্কী-মাদানী আয়াতের পরিচয় ও তা চিনার উপায় জানার ফায়দা হল, এর মাধ্যমে নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।[৫৩]

মাক্কী-মাদানী আয়াতের পরিচয়ঃ

এ ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়ঃ

১. ইয়াইয়া ইবনে সাল্লাম রহ. বলেন,

যেসব আয়াত হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে সেগুলো হল মাক্কী আয়াত। যদিও তা মদীনায় নাযিল হয়ে থাকে। আর যেসব আয়াত হিজরতের পরে নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত। যদিও তা মক্কায় নাযিল হয়। এটাই প্রসিদ্ধ মত।

২. যেসব আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে সেগুলোই মাক্কী আয়াত। চাই তা হিজরতের পূর্বে নাযিল হোক কিংবা পরে। পক্ষান্তরে যেসব আয়াত মদীনায় নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী আয়াত। চাই তা হিজরতের আগে নাযিল হোক কিংবা পরে।

৩. যেসব আয়াত দ্বারা মক্কবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাক্কী আয়াত। আর যেসব আয়াত মদীনাবাসীকে সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো হল মাদানী আয়াত। এটি হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মত।

---

৫২. তারিখুল কুরআন-১৮৬, উলুমুল কুরআন-২০১
৫৩. আল বুরহান-১৩২

মাক্কী-মাদানী আয়াত চিনার উপায়ঃ

কুরআনে তিন ধরনের সূরা পাওয়া যায়, ১। মাক্কী ২। মাদানী ৩। মাক্কী ও মাদানী নিয়ে মতবিরোধপূর্ণ সূরাসমূহ।

মাদানী সূরার সংখ্যা ২০টি। আর তা হল-

১. সূরা বাকারা
২. সূরা আলে ইমরান
৩. সূরা নিসা
৪. সূরা মায়েদা
৫. সূরা আনফাল
৬. সূরা তাওবা
৭. সূরা নূর
৮. সূরা আহযাব
৯. সূরা মুহাম্মদ
১০. সূরা ফাতহ
১১. সূরা হুজরাত
১২. সূরা হাদীদ
১৩. সূরা মুজাদালা
১৪. সূরা হাশর
১৫. সূরা মুমতাহিনা
১৬. সূরা জুমা
১৭. সূরা মুনাফিকুন
১৮. সূরা তালাক
১৯. সূরা তাহরীম
২০. সূরা নাসর

মাক্কী ও মাদানী নিয়ে মতবিরোধপূর্ণ সূরাসমূহ ১২ টি। তা হল-

১. সূরা ফাতেহা
২. সূরা রাআ'দ
৩. সূরা আর রহমান
৪. সূরা সফ
৫. সূরা তাগাবুন
৬. সূরা তাতফিফ
৭. সূরা কদর
৮. সূরা বায়্যিনাহ
৯. সূরা যিলযাল
১০. সূরা ইখলাস
১১. সূরা ফালাক
১২. সূরা নাস

এ ছাড়া কুরআনের বাকি ৮২ টি সূরা হল মাক্কী। কুরআনের সর্বমোট সূরাসংখ্যা ১১৪ টি।

মাক্কী আয়াত চিনার আলামত

মাক্কী আয়াত চিনার আলামত ছয়টি-

১. যেসব সূরায় সেজদার আয়াত রয়েছে তা মাক্কী সূরা।
২. যেসব সূরায় كلا শব্দ রয়েছে তা মাক্কী সূরা।
৩. যেসব সূরায় يا أيها الناس রয়েছে তা মাক্কী সূরা।
৪. যেসব সূরায় পূর্ববর্তী নবী ও তাদের উম্মতের ঘটনা বর্ণিত রয়েছে তা মাক্কী সূরা। তবে সূরা বাকারা ব্যতীত।
৫. যেসব সূরায় আদম আ. ও ইবলিসের ঘটনা রয়েছে তা মাক্কী সূরা। তবে সূরা বাকারা ব্যতীত।
৬. যেসব সূরা হুরুফে মুকাত্তাআত দ্বারা শুরু করা হয় যেমন الم-الر-حم তা মাক্কী সূরা। তবে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ব্যতীত।

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. তাওহীদ, আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা ও রিসালাত সাব্যস্ত করা, কিয়ামত সম্পর্কে সর্তক করা ইত্যাদি মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য।

২. পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উম্মতের ঘটনা বয়ান করত তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সর্তক করা এবং তাদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

৩. শরীয়তের ব্যাপক বিধান উল্লেখ করা ও মানবীয় উন্নত চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক হয়।

৪. ছোট ছোট বাক্য ও সংক্ষিপ্ত ইবারত

মাদানী আয়াত চিনার আলামত:

১. যেসব সূরায় আবশ্যকীয় বিধি-বিধান বয়ান করা হয়েছে তা মাদানী সূরা।

২. যেসব সূরায় মুনাফিকদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে তা মাদানী সূরা। তবে সূরা আনকাবুত ব্যতীত।

৩. যেসব সূরায় আহলে কিতাবদের সাথে মুজাদালার কথা বলা হয়েছে তা মাদানী সূরা।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. মাদানী সূরায় লেনদেন, পরিবারনীতি, জিহাদনীতি, হুদুদ ও কিসাসের আহকাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. এসব সূরায় আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

৩. মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করত তাদের অনিষ্টতার ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সর্তক করা হয়েছে।

সাত হরফে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাখ্যাঃ

আরবদের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ছিল। একেক গোত্রের স্বভাবগত ভাবে একেক ভাষা।

কুরআন প্রথমে আরবীতে কুরাইশদের আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল হচ্ছিল, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক উপায়ে কুরআন পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আরবের সকল ভাষাবাসীদের জন্য কুরআন পাঠ সহজলভ্য হয়ে যায়। এর প্রেক্ষিতে কুরআন সাত হরফে নাযিল হতে থাকে।

উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ الله عليه وسلم، كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِيْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلٰى حَرْفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِيْ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِيْ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ.ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلٰى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِيْ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ. ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوْا.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিফার গোত্রের জলাশয়ের (কূপের) নিকট ছিলেন। তখন জিবরীল আ. তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি আপনার উম্মতকে এক হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নিকট তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আমার উম্মত এতে সমর্থ হবে না।

জিবরীল আমীন দ্বিতীয়বার এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে দুই হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ান। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার উম্মত এতে সমর্থ হবে না। আমি আল্লাহর নিকট তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।

জিবরীল আমীন তৃতীয়বার এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে তিন হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ান। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমার উম্মত এতে সমর্থ হবে না। আমি আল্লাহর নিকট তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করি।

জিবরীল আমীন চতুর্থবার তাঁর নিকট এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি যেন আপনার উম্মতকে সাত হরফে (পদ্ধতিতে) কুরআন শিক্ষা দেন। তারা এর যে কোন একটি পদ্ধতিতে পাঠ করলে তা যথার্থ হবে।[৫৪]

অন্য বর্ণনায় উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُما رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ ﷺ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِيْ نَفْسِيْ مِنَ التَّكْذِيْبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ما قدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّما أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لِيْ: يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلٰى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلٰى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلٰى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأْهُ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، فَقُلْتُ:

৫৪. সহীহ মুসলিম, হদীস নং: ১৭৯১

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ.

অর্থ: তিনি বলেন, আমি মসজিদে থাকা অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করে সালাত আদায় করা শুরু করল। সে এমন পদ্ধতিতে কিরাআত পড়ল যা আমার নিকট অভিনব মনে হল। অতঃপর আরেক ব্যক্তি প্রবেশ করে আগের ব্যক্তি থেকে ভিন্নতর (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়ল। আমরা সালাত শেষ করে সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি বললাম, এই ব্যক্তি এমন (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়েছে যে, আমার নিকট অভিনব মনে হয়েছে। অতঃপর আরেকজন এসে তার পূর্ববর্তী জনের থেকে ভিন্নতর (পদ্ধতিতে) কিরাআত পড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়ের কিরাআত সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলেন। এতে আমার মনে মিথ্যা ও অবিশ্বাসের উদ্রেক হল, এমনকি জাহিলী যুগেও এমন তীব্র অবিশ্বাসের উদ্রেক হয়নি। আমাকে যে চিন্তা আচ্ছন্ন করেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে আমার বক্ষস্থলে আঘাত করলেন। এতে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে পড়লাম। যেন আমি ভীত হয়ে মহান আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার নিকট বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, আমি যেন এক হরফে (উচ্চারণ পদ্ধতিতে) কুরআন পড়ি। আমি অনুরোধ করে বললাম, আমার উম্মতের প্রতি সহজসাধ্য করুন। আমাকে প্রত্যুত্তরে বলা হল, তা দু'হরফে (পদ্ধতিতে) পড়ুন। আমি তাঁকে পুনরায় অনুরোধ করলাম যে, আমার উম্মতের প্রতি সহজসাধ্য করুন। তৃতীয়বারে আমাকে বলা হল, তা সাত হরফে (পদ্ধতিতে) পাঠ করুন এবং এ সাতবারের প্রতিবার প্রতি উত্তরের পরিবর্তে আপনার জন্য একটি করে কিছু আমার নিকট প্রার্থনা করতে পারেন (যা আমি কবুল করব)। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন,

হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। আর তৃতীয় প্রার্থনাটি আমি সেদিনের জন্য স্থগিত করে রেখেছি, যেদিন সমগ্র সৃষ্টি, এমনকি ইবরাহীম আ. পর্যন্ত আমার প্রতি আগ্রহী হবেন।[৫৫]

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَأَنِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيْدُهُ فَيَزِيْدُنِيْ حَتّٰى انْتَهٰى إِلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِيْ أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِيْ يَكُوْنُ وَاحِدًا لَا يَخْتَلِفُ فِيْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিবরীল আ. আমাকে একটি রীতিতে কুরআন মাজীদ পড়ালে আমি তা পড়ে নিলাম। আমি তার কাছে অতিরিক্ত চাইলে তিনি অতিরিক্ত বা অন্য রীতিতে পড়ে শুনতাম। এভাবে তিনি সাত সাতটি রীতি বা আঞ্চলিক নিয়মে আমাকে কুরআন মাজীদ পড়ে শুনিয়েছেন।

ইবনে শিহাব বলেছেন, আমি এ মর্মে অবহিত হয়েছি যে, এ সাতটি পদ্ধতি বা রীতিতে কুরআন মাজীদ পড়ার কারণে হালাল হারামের ব্যাপারে কোন পার্থক্য হয় না, বরং তা একই থাকে।[৫৬]

উপরোক্ত হাদীস তিনটি দ্বারা বুঝা গেল, যাদের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে তথা আরবদের আঞ্চলিক ভাষার ভিন্নতা থাকার কারণে বুঝার সুবিধার্থে আল্লাহ তাআলা আরবী সাত ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। যাতে যার কাছে যে ভাষায় কুরআন পাঠ সহজ মনে হয় সেই ভাষায় পাঠ করতে পারে।

---

৫৫. সহীহ মুসলিম, ১৭৮৯
৫৬. সহীহ মুসলিম, ১৭৮৭

বুখারী শরীফে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ"

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এই কুরআন সাত হরফে (সাত কেরাতে) অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং যেই পদ্ধতি তোমাদের নিকট সহজ মনে হয় সেই পদ্ধতি অবলম্বন করে তোমরা তা তেলাওয়াত কর।[৫৭]

আল্লামা সুয়ুতি রহ. বলেন, সাবআতু আহরুফের হাদীস মোট একুশ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

আবুল কাসেম সাল্লাম রহ. বলেন, এটি একটি মুতাওয়াতের হাদীস। অসংখ্য রাবী থেকে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এটি মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস।

সাত হরফ হাদীসের ব্যাখ্যা:

উল্লিখিত "সাবআতু আহরুফের হাদীস" এর ব্যাখ্যা নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য কি এ নিয়ে মোট পয়ত্রিশটি মত পাওয়া যায়।

আল্লামা ইবনুল জাযারী রহ. বলেন, এ ব্যাপারে মোট চল্লিশটি মত পাওয়া যায়। তবে একটি আরেকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমরা এখানে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ব্যাখ্যা তুলে ধরছি–

১. "সাবআতু আহরুফ" দ্বারা উদ্দেশ্য আরবদের সাত অঞ্চলের ভাষা।

আবু হাতেম সাজেসতানী রহ. বলেন, আরবদের সাত অঞ্চলের ভাষা দ্বারা উদ্দেশ্য হল,

১) কুরাইশ
২) তামীম
৩) রাবিয়া

---

৫৭. সহীহ বুখারী, ৪৯৯২

৪) সা'দ বিন বকর

৫) হুযাইল

৬) হাওয়াযিন

৭) আযদ ইত্যাদি গোত্রসমূহের অঞ্চলের ভাষা।

২. এক জামাত উলামায়ে কেরাম বলেন, "সাবআতু আহরুফ" দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআনের সাত ধরনের বিধান। আর তা হল,

১) কুরাইশ

২) আদেশ

৩) নিষেধ

৪) প্রতিশ্রুতি

৫) ধমকি

৬) বাক-বিতণ্ডা

৭) উদাহরণস্বরূপ ইত্যাদি বিধান

৩. এক জামাত উলামায়ে কেরাম বলেন, "সাবআতু আহরুফ" দ্বারা উদ্দেশ্য, কুরআনের সাত কেরাত। তবে প্রথম মতকেই উলামায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন।[৫৮]

---

৫৮. মাবাহিছ ফি উলূমিল কুরআন-১৪৮, আল-ইতকান-১০৫

কুরআন পার্ট-৩

এ অধ্যায়ে রয়েছে-

✓ কেরাত শাস্ত্র ও কারীগণ
✓ কেরাতের প্রকারভেদ, হুকুম ও নীতিমালা
✓ কেরাত সংখ্যা একের অধিক হওয়া
এবং সাত কেরাতে সীমাবদ্ধ থাকার কারণসমূহ
✓ কুরআন তেলাওয়াতের আদব ও নীতিমালা
✓ কুরআন পড়ে বিনিময় নেওয়ার বিধান

কেরাত শাস্ত্র ও কারীগণ:

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর যুগ থেকে আজ অবধি অনেক কেরাত পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর প্রসিদ্ধ কারী সাহাবায়ে কেরাম একেক এলাকায় একেকজন কেরাত শিক্ষা দিতেন এবং তাঁরা প্রত্যেকই তা সনদসূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত করতেন।

কারী সাহাবাদের অন্যতম ছিলেন, উবাই ইবনে কা'ব, আলী ইবনে আবী তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু মুসা আশআরী রা.। তাদের থেকে শহরের সাহাবা ও তাবেয়ীগণ কেরাত শিখে নিতেন অতঃপর পুরো পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে দিতেন। প্রত্যেক কারীই তাঁর কেরাতকে সনদসূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত করতেন।

আল্লামা হাফেয যাহাবী রহ. (মৃত্যু: ৭৪৮ হি.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাত কারী হলেন:

১. হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি.

২. হযরত উসমান রাযি.

৩. হযরত আলী রাযি.

৪. হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রাযি.

৫. হযরত আবু দারদা রাযি.

৬. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.

৭. হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি.

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে এক জামাত সাহাবা কেরাতের জ্ঞান লাভ করেন। তাদের অন্যতম হলেন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব রাযি.।

প্রসিদ্ধ এসব কারী সাহাবাগণ থেকে এক জামাত তাবেয়ী কেরাত শিখে তা আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেন।

মদীনায় কারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, ইবনে মুসায়্যিব, উরওয়া, সালেম, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, সুলাইমান, আতা ইবনে ইয়াসার, মুআজ ইবনে হারেছ, আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয, ইবনে শিহাব যুহরী, মুসলিম ইবনে জুনদুব ও যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ।

মক্কায় কারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, উবাইদ ইবনে ওমাইর, আতা ইবনে আবি রাবাহ, তাউস, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও ইবনে আবী মুলাইকাহ প্রমুখ।

কুফায় কারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, আলকামা, আসওয়াদ, মাসরূক, উবাইদাহ, আমর ইবনে শুরাহবীল, হারেস ইবনে কায়েস, আমর ইবনে মাইমুন, আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখঈ ও শা'বী প্রমুখ।

বসরায় কারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, আবু আলীয়া, আবু রাজা, নাসর ইবনে আসেম, ইয়াহয়া ইবনে ইয়া'মার, হাসান, ইবনে সিরীন ও কাতাদা প্রমুখ।

শামে কারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, মুগিরা ইবনে আবু শিহাব আল মাখযুমী, সাহিবু উসমান রা., খলিফা ইবনে সা'দ ও সাহিবু আবু দারদা রাযি. প্রমুখ।

সাত কেরাতের প্রবর্তন

প্রথম শতকের শুরুর দিকে তাবেয়ীদের জামাত নিজেদেরকে শুধু কেরাত শাস্ত্রের জন্য বিলীন করে দেন। তাঁরা কেরাত শাস্ত্রের জন্য নীতি নির্ধারণ করেন। ফলে কেরাত শাস্ত্রটিও অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় শাস্ত্রীয়রূপ লাভ করে।

পূর্বে বর্ণিত মক্কা, মদীনা, কুফা ও বসরা ইত্যাদি শহরসমূহের কারীদের পরে প্রথম শতকের কারীগণ প্রসিদ্ধ হয়ে যান। তাঁরা কেরাত

শাস্ত্রে অনুসরণীয় হয়ে যান। ফিকহী মাযহাব ইমামদের মত তাদেরকেও সকলে কেরাতের ক্ষেত্রে ইমাম হিসেবে মানতেন। তাঁদের কাছে লোকজন কেরাত শিখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে সফর করে আসতেন।

ফিকহের ময়দানে যেমন চার মাযহাব মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত হয়েছে যদিও আরো অনেক মাযহাব পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। তেমনই একাধিক কারী থাকা সত্ত্বেও সাতজন কারীর কেরাত প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত হয়ে যায়। প্রথমযুগের পর তাঁদেরকেই সাত কারী বলা হত। আজ যাদেরকে আমরা "কুররায়ে সাবআ" বলে থাকি।

প্রসিদ্ধ এ সাতজন কারী হলেন,

১. হযরত আবু আমর রহ.

২. হযরত নাফে' রহ.

৩. হযরত আসেম রহ.

৪. হযরত হামযা রহ.

৫. হযরত কাসায়ী রহ.

৬. হযরত ইবনে আমের রহ.

৭. হযরত ইবনে কাসীর রহ.

সাত কেরাতে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণঃ

পূর্বে আমরা জেনেছি যে, প্রসিদ্ধ সাত কেরাত ব্যতীত আরো প্রচুর কেরাত বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই সাত কেরাতই মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের পর্যন্ত মুতাওয়াতের সূত্রে এই সাত কেরাতই পৌঁছেছে। এগুলোর উপর উম্মত ইত্তিফাক তথা একমত হয়ে গেছেন।

উলামায়ে কেরাম এ সাত কেরাত ছাড়াও আরো তিনজন কারীর কেরাতকে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হলেনঃ

১. আবু জাফর ইয়াযিদ ইবনে কা'কা' আল মাদানী

২. ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-হাযরামী

৩. খালফ ইবনে হিশাম।

এ দশজন কারীর কেরাত মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এসব কেরাত নির্ভরযোগ্য। এ দশ কেরাত ব্যতীত অন্যান্য কেরাত দুর্লভ; তবে গ্রহণযোগ্য।

সাত কেরাতের উপর একমত হওয়ার বিষয়টি তৃতীয় শতকের পর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হয়েছে। কেননা, এ সাত কারীর কেরাত তাদের ছাত্ররা একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তা আমাদের কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত।[৫৯]

কেরাতের প্রকারভেদ, হুকুম ও নীতিমালা

কেরাত ছয় প্রকার:

১. মুতাওয়াতির কেরাত। যেসব কেরাত এমন সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে এসেছে যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব।
২. মাশহুর কেরাত। যেসব কেরাত মুতাওয়াতিরের মানে উন্নীত না, তবে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এবং তা আরবী ভাষা ও মাসহাফে উসমানীর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ ধরনের কেরাত পড়া যাবে।
৩. খবরে ওয়াহেদ কেরাত। যেসব কেরাত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে তা আরবী ভাষা অথবা মাসহাফে উসমানীর সাথে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের কেরাত পড়ার অবকাশ নেই।
৪. শায কেরাত। যেসব কেরাত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি এবং তা আরবী ভাষা অথবা মাসহাফে উসমানীর সাথে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের কেরাত পড়ার অবকাশ নেই।
৫. মাওযু তথা জাল কেরাত। যেসব কেরাতের কোন ভিত্তি নেই। এ ধরনের কেরাত পাঠ করা, বর্ণনা করা উভয়টি কবীরা গুণাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ধমকি বর্ণিত হয়েছে।
৬. মুদরাজ কেরাত। কুরআনের কোন ভাষ্য স্পষ্ট করার জন্য যেখানে তাফসীর স্বরূপ কোন বক্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। এ ধরনের কেরাত পড়ার অবকাশ নেই।

৫৯. (মুবাহিছ, ১৬৪)

মোট কথা, প্রথম দুই প্রকার পাঠ করা যাবে। নামাজ আদায় শুদ্ধ হবে এবং শেষের চার প্রকার পড়ার অবকাশ নেই এবং ওই কেরাত দিয়ে নামাজ আদায় করা হলে তা শুদ্ধ হবে না।

মুতাওয়াতির কেরাত হল প্রসিদ্ধ সাত কেরাত। আর খবরে ওয়াহেদ কেরাত হল প্রসিদ্ধ সাত কেরাতকে দশে পূর্ণতা দানকারী তিন কেরাত ও সাহাবাদের থেকে বর্ণিত কেরাত সমূহ। শায কেরাত হল প্রসিদ্ধ দশ কেরাত ও সাহাবায়ে কেরামের কেরাত ছাড়া বাকি সকল কেরাত।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, প্রসিদ্ধ দশ কেরাতের সবগুলোই মুতাওয়াতির কেরাতের অন্তর্ভুক্ত।

কেরাত সহীহ হওয়ার নীতিমালা

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কোন রেওয়ায়েত সহীহ হওয়া নির্দিষ্ট কোন কিতাব বা শ্রেণির সাথে সম্পৃক্ত নয়। সুতরাং এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, সাত বা দশ কেরাতের সব রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ বা সহীহ। শায কেরাতের মধ্যে কখনো সহীহ রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। বুঝা গেল সহীহ হওয়া পুরো বিষয়টা সহীহ হওয়ার শর্তসমূহ থাকা না থাকার উপর নির্ভরশীল।

আল্লামা আবু শামাহ রহ. বলেন, সাত কেরাতের মধ্যে রেওয়ায়েত পাওয়া গেলেই কেউ যেন ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে সহীহ হওয়ার ট্যাগ লাগিয়ে না দেয়। সহীহ হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ শর্তের উপর নির্ভরশীল। কোন শ্রেণি বা কিতাবের সাথে সম্পৃক্ত নয়।[৬০]

কেরাত সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত থাকা জরুরী:

১. আরবী ভাষার সাথে কেরাতের মিল থাকা।

২. উসমানী মাসহাফসমূহের একটির সাথে মিল থাকা।

৩. সহীহ সনদে বর্ণিত হয়ে আসা।

---

৬০. আল-মুরশিদুল ওয়াজিয

প্রসিদ্ধ দশ কারী'র পরিচিতি

১. আবু আমর ইবনে আলা। তাকে শায়খুর রুওয়াতও বলা হয়। পুরো নাম হল, যিয়াদ ইবনে আলা ইবনে মাযেনী আল বাসরী। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় তাঁর নাম ইয়াহয়া। তিনি বাগদাদে ১৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

○ আবু আমর হাফস ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয। (মৃত্যু: ২৪৬)

○ আবু শুয়াইব সালেহ ইবনে যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস সুসী। (মৃত্যু: ২৬১)

২. ইবনে কাসীর। পুরো নাম আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর আল মাক্কী। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। তিনি মক্কায় (১২০ হি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

○ আবুল হাসান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন আবু বুয্যা মুআজ্জিনে মাক্কী নামে। (মৃত্যু: ২৫০ হি.)

○ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালেদ ইবনে সাঈদ আল মাক্কী আল মাখযুমী। তিনি আবু আমর কুম্বল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (মৃত্যু: ২৯১ হি.)

৩. নাফে' মাদানী। পুরো নাম, নাফে' ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু নাঈম আল-লায়ছী। তিনি মদীনায় (১৬৯ হি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

○ আবু মুসা ঈসা ইবনে মুনয়া কালুন। কথিত আছে যে, আল্লামা নাফে' রহ. তাঁর বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের জন্য তাকে "কালুন" উপাধিতে ভূষিত করেন। "কালুন" রূমের ভাষায় অর্থ হল "জায়্যিদ"। ভাল। (মৃত্যু: ২২০)

○ উসমান ইবনে সাঈদ আল মিসরী। তিনি আবু সাঈদ ওয়ারশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (মৃত্যু: ১৯৭)

৪. ইবনে আমের শামী। পুরো নাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আমের আল-ইয়াহছাবী। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিকের সময়কালে দামেশকের কাযী ছিলেন। দামেশকে ১১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- হিশাম ইবনে আম্মার ইবনে নাসির আল কাযী দামেশকী। (মৃত্যু: ২৪৫)
- আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে বাশীর ইবনে যাকওয়ান আল কুরাশী দামেশকী। (মৃত্যু: ২৪২)

৫. আসেম কুফী। পুরো নাম, আবু বকর আসেম ইবনে আবু নুজুদ আল কুফী। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। মদীনায় ১২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- আবু বকর শু'বা ইবনে আব্বাস ইবনে সালেম আল-কুফী। (মৃত্যু: ১৯৩)
- হাফস ইবনে সুলাইমান ইবনে মুগীরাহ আল বায্যার আল-কুফী। (মৃত্যু: ১৮০)

৬. হামযা আল-কুফী। পুরো নাম, হামযা ইবনে হাবীব ইবনে উমারা আয্যায়্যাত আত-তায়মী। তিনি খলীফা আবু জাফর আল-মানসূরের সময়কালে ১৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- খালফ ইবনে হিশাম আল বায্যার। (মৃত্যু: ২২৯)
- আবু ঈসা খাল্লাদ ইবনে খালেদ কুফী। (মৃত্যু: ২২০)

৭. আল কাসায়ী আল -কুফী। পুরো নাম, আবুল হাসান আলী ইবনে হামযা আল কাসায়ী কুফী। তিনি রায় নামক এলাকার রানবুয়া নামক গ্রামে ১৮৯ হিজরী'তে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- আবু হারেস লায়ছ ইবনে খালেদ বাগদাদী। (মৃত্যু: ২৪০ হি.)
- আবু আমর হাফস ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয। (মৃত্যু: ২৪৬ হি.)

৮. আবু জাফর মাদানী। পুরো নাম, ইয়াযিদ ইবনে কা'কা'। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। মদীনায় ১২৮ হিজরী'তে মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- আবুল হারেস ঈসা ইবনে ওরদান আল-মাদানী। (মৃত্যু: ১৬০ হি.)
- আবুর রাবী' সুলাইমান ইবনে মুসলিম আল-মুযানী। (মৃত্যু: ১৭০ হি.)

৯. ইয়াকুব আল বাসরী। পুরো নাম, আবু মুহাম্মদ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে যায়েদ হাযরামী। তিনি বাসরায় ২০৫ হিজরী'তে মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুতাওয়াক্কিল লু'লুয়ী। (মৃত্যু: ২৩৮ হি.)
- আবুল হাসান ওয়াহ ইবনে আব্দুল মু'মিন আল বাসরী। (মৃত্যু: ২৩৪ হি.)

১০. খালফ। পুরো নাম, আবু মুহাম্মদ খালফ ইবনে হিশাম ইবনে ছা'লাব আল বায্যার। তিনি ২২৯ হিজরী'তে মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর থেকে যারা রেওয়ায়েত করেন:

- আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আল ওয়র্রাক। (মৃত্যু: ২৮৬ হি.)
- আবুল হাসান ইদরীস ইবনে আব্দুল কারীম আল বাগদাদী। (মৃত্যু: ২৯২ হি.)

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত ও সতর্কতা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ছিলেন বিশুদ্ধ ও সুন্দর লাহানে তেলাওয়াতকারী। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মত তেলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ ও সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করলে কুরআনের মর্ম বুঝতে সহজসাধ্য হয়। কুরআনের মুজেযা উপলব্ধি হয়। হৃদয়স্পর্শী হয়।

প্রত্যেক যুগেই সালাফ ও খালাফগণ বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাজবীদের সাথে কুরআন তেলাওয়াত করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে গ্রন্থাবলী লিখেছেন।

কুরআন তেলাওয়াত করা এটি ইসলামের একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য। হাদীসে এ ব্যাপারে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত,

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

অর্থ: "তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত, যাকে আল্লাহ তাআলা কিতাবের জ্ঞান দান করেছেন এবং তিনি তা থেকে গভীর রাতে তেলাওয়াত করেন। দ্বিতীয়ত, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি সেই সম্পদ দিনরাত দান করতে থাকেন।"[৬১]

কুরআনে হিফয করার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআনে কারীম হিফয রেখেছে এবং এর উপর আমল করেছে তার জন্য জান্নাত অনিবার্য এবং তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তি

৬১. সহীহ বুখারী-৫০২৫, সহীহ মুসলিম-৮১৫

সম্পর্কে তার শাফায়াত কবুল করা হবে যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল।

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ" قَالَ أَبُو عِيسَى: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তা হিফয রেখেছে, এর হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনেছে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশজন ব্যক্তি সম্পর্কে তার শাফায়াত কবুল করবেন যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল।"[৬২]

কুরআনের একটি অক্ষর পাঠকারী ব্যক্তিরও সওয়াব অর্জিত হয়। একটি আয়াতের প্রতিটি অক্ষরে দশগুণ বেশি নেকী হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত,

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ، يَقُوْلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ".

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, তার একটি সওয়াব হবে। আর এর একটি সওয়াব দশটি সওয়াবের সমান। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।"[৬৩]

৬২. সুনানে তিরমিযী-২৯০৫
৬৩. জামে' তিরমিযী-২৯১০

হাদীস শরীফে কুরআনে কারীম মুখস্থ করার ব্যাপারে যেমনিভাবে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে; তেমনই মুখস্থ করার পর তা ভুলে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সতর্কতা বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্তরে কুরআন গেঁথে (মুখস্থ) রাখে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে, তবে সে উট তার নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর যদি বাঁধন খুলে দেয়, তবে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।[৬৪]

অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَاهَدُوْا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! কুরআন বাঁধন ছাড়া উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে দৌড়ে যায় (অর্থাৎ, ইয়াদ না করলে দ্রুত ভুলে যায়)।"[৬৫]

কুরআন তেলাওয়াতের উত্তম দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ

---

৬৪. সহীহ বুখারী-৫০৩১
৬৫. সহীহ বুখারী-৫০৩৩

الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا.

অর্থ: তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি লেবুর মত যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, তাঁর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু আর ফাসিক ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তাঁর দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মত, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই।[৬৬]

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ". قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার হৃদয়ে কুরআনের কিছুই নেই সে বিরান ঘরের মত।[৬৭]

হযরত আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ حَلِّه فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً" قَالَ: أَبُوْ عِيسٰى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে কুরআন হাযির হয়ে বলবে, হে আমার প্রভু, একে (কুরআনের

৬৬. সহীহ বুখারী-৫০২০, সহীহ মুসলিম-১৮৬০
৬৭. সুনানে তিরমিযী-২৯১৩

বাহককে) অলংকার পরিয়ে দিন। তারপর তাকে সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু, তাকে আরো পোশাক দিন। তাই তাকে মর্যাদার পোশাক পরানো হবে। সে আবার বলবে, হে আমার প্রভু, তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তখন তিনি তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি এক এক আয়াত পাঠ করতে থাক এবং উপরের দিকে উঠতে থাক। এমনিভাবে প্রতি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব (মর্যাদা) বাড়ানো হবে।"[৬৮]

কুরআনে কারীম হল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কুরআন পাঠ করলে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা হওয়া যায়। কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অধিকতর নৈকট্য অর্জন করা যায়।

হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ."

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার দুই রাকাত নামাযে যেভাবে মনঃসংযোগ করেন এর চেয়ে কোন কিছুতেই এই প্রকার করেন না। বান্দা যতক্ষণ নামাযে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ তার মাথার উপর সওয়াব বর্ষিত হতে থাকে। বান্দা কুরআন পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার যতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে পারে অন্যকিছু দ্বারা তাঁর এত নৈকট্য অর্জন করতে পারে না।"[৬৯]

কুরআন হল সর্বকালের সেরাগ্রন্থ। এতে জীবন-সমস্যার সব বিষয়ের সমাধান রয়েছে। এতে সবধরনের ফেতনা থেকে উত্তরণের পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে।

---

৬৮. সুনানে তিরমিযী-২৯১৫
৬৯. সুনানে তিরমিযী, ২৯১১

হারিস আল-আওয়ার রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ مَرَرْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوْضُوْنَ فِيْ الْأَحَادِيْثِ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَلِيٍّ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوْا فِي الْأَحَادِيثِ. قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "أَلَا إِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ" فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى فِيْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ وَهُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِه الأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلٰى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِيْ عَجَائِبُهُ هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتّٰى قَالُوْا (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ) مَنْ قَالَ بِه صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِه أُجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِه عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ". خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. قَالَ أَبُو عِيسٰى هٰذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ. وَفِي الْحَارِثِ مَقَالٌ.

অর্থ: তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদে গিয়ে দেখি যে, কিছু লোক নানারকম আলাপ করছে। আমি আলী রাযি.-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, লোকেরা নানা রকম আলাপচারিতা করছে? তিনি প্রশ্ন করলেন, তারা কি তাই করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শোন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হুঁশিয়ার! শীঘ্রই ফিতনা-ফাসাদ দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ফিতনা হতে আত্মরক্ষার পন্থা কী? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার কিতাব (কুরআন)। এতে আছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ ও পরবর্তীদের সংবাদ এবং তোমাদের মাঝে ফায়সালার বিধান।

এটা (সত্য-মিথ্যার মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজনকারী, কোন অর্থহীন ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি অহংকারবশত এটা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার অহংকার চূর্ণ করবেন। এটাকে বাদ দিয়ে যে হিদায়াত অন্বেষণ করবে আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন। এটা হল আল্লাহ তাআলার মযবুত রশি, হিকমাত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ এবং সহজ-সরল পথ। তা অনুসরণ করলে মানুষের চিন্তাধারা বিপথগামী হয় না এবং এতে যবানও আড়ষ্ট হয় না।

আলিমগণ এ থেকে তৃপ্ত হয় না (যতই পড়ে ততই ভালো লাগে), বারবার পড়লেও এটা পুরানো হয় না এবং এর রহস্য ও নিগুঢ় তত্ত্বের শেষ নেই। এটা সেই গ্রন্থ যা শোনা মাত্রই জিনেরা বলে উঠেছিল, "আমরা এক আশ্চর্যজনক কুরআন শুনলাম যা সঠিক পথের সন্ধান দেয়। সুতরাং আমরা এতে ঈমান এনেছি"[৭০]। যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী কথা বলে সে সত্য বলে আর যে ব্যক্তি কুরআন অনুসারে আমল করে সে প্রতিদান পায়। যে এর সাহায্যে ফায়সালা করে সে ইনসাফ করে এবং যে এর দিকে আহ্বান করে সে সঠিক পথ দেখায়। হে আওয়ার! তুমি এটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধর।[৭১]

প্রসিদ্ধ সূরাসমূহের ফযীলত:

আমাদের সমাজে মানুষের কথায় ও তথাকথিত বক্তাদের বয়ানে জাল হাদীসের প্রচুর ছড়াছড়ি। কুরআর আল্লাহর কালাম। ইসলামের প্রথম প্রামাণ্যই হল এ আল-কুরআন। তাই এ কুরআন সম্পর্কে কিছু বলতে হলে বা বয়ান করতে হলে অবশ্যই তাহকীক ও যাচাই-বাছাই করত তা জন-সাধারণের সামনে পেশ করতে হবে। তাহকীক ও যাচাই করে কথা বলা সর্বক্ষেত্রেই পালনীয় ও আবশ্যক বিধান। তা মানা প্রত্যেক মুমিনের উপরই ওয়াজিব। আর তা যদি হয় সর্বকালের সেরাগ্রন্থ আল-কুরআনের ব্যাপারে তাহলে তো বলাই বাহুল্য। কারণ,

---

৭০. জিন: ১-২

৭১. সুনানে তিরমিযী-২৯০৬

কুরআনের ব্যাপারে যাচাই না করে কোন কথা বলা মানে আল্লাহ তাআলার উপরে অপবাদ দেওয়া।[৭২]

কুরআনের সূরার ফযীলত বয়ানের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রায় সকল লিখনী ও বয়ানে জাল হাদীসগুলো চলে আসে। আমরা আমাদের মনের অজান্তে তাহকীক ও যাচাই না করেই জাল হাদীস বয়ান করে হাদীসে বর্ণিত কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়ে পড়ি। তাই নিচে তাহকীকসহ এখানে কিছু প্রসিদ্ধ সূরার ফযীলতের আলোচনা তুলে ধরছি।

সূরা ফাতেহার ফযীলত:

সূরা ফাতেহাকে কুরআন শরীফের মূল বলা হয়। এটিকে সূরাতুশ শিফা, উম্মুল কিতাব, উম্মুল কুরআন, আল আসাস, আল কাফিয়া, আল ওয়াফিয়া ও সূরাতুল হামদ নামে আখ্যা দেওয়া হয়।

এ সূরার ফযিলতের ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে আমি তিনটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করছি।

১. আবু সাঈদ ইবনুল মুআল্লা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلْ اللهُ ﴿اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ﴾ ثُمَّ قَالَ لِيْ: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِيَ أَعْظَمُ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ: {الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ} هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِيْ أُوْتِيْتُهُ.

অর্থ: তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

৭২. আল-ইয়াজু বিল্লাহ

আমাকে ডাকেন। কিন্তু ডাকে আমি সাড়া দেই নি। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সালাত আদায় করছিলাম। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেন নি যে, ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সাড়া দেবে আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে, যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেন।[৭৩]

তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগেই তোমাকে আমি কুরআনের অতি মহান একটি সূরা শিক্ষা দিব। তারপর তিনি আমার হাত ধরেন। এরপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি বলেন নি যে আমাকে কুরআনের অতি মহান একটি সূরা শিক্ষা দিবেন? তিনি বললেন, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, এটা বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহান কুরআন যা কেবল আমাকেই দেওয়া হয়েছে।[৭৪]

২. আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا بِهِ

৭৩. আনফাল-৮/২৪
৭৪. সহীহ বুখারী-৪৪৭৪

قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ رَقَى لَا تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না, তখন তাদের কেউ বলল, এখানে যে কাফেলাটি অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভালো হত। সম্ভবত, তাদের কারও কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম আমি ঝাঁড়-ফুঁক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী কর নি। অতএব, আমি তোমাদের ঝাড়-ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা একপাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন" (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন হতে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল; যেন তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, এগুলো বণ্টন কর। কিন্তু যিনি ঝাঁড়-ফুঁক করেছিলেন তিনি বললেন এটা করব না, যে পর্যন্ত না

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কী নির্দেশ দেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তুমি কীভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি দুআ? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। যা পেয়েছ বণ্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন।[৭৫]

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا - غَيْرُ تَمَامٍ". فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "قَالَ اللهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. قَالَ اللهُ تَعَالَى حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. قَالَ اللهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ. وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}. قَالَ هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ".

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরাআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি তার সালাত ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল, পূর্ণাঙ্গ হল না। এ কথাটা তিনবার বলেছেন। আবু হুরায়রা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা

৭৫. সহীহ বুখারী-২২৭৬, সহীহ মুসলিম-২২০১

যখন ইমামের পিছনে সালাত আদায় করব তখন কী করব? তিনি বললেন, তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেছেন, আমার এবং আমার বান্দার মাঝে আমি সালাতকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি এবং আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। বান্দা যখন বলে, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য', আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে'। আর সে যখন বলে, 'তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়'; আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, 'বান্দা আমাকে নিয়ে স্তুতি গেয়েছে।' সে যখন বলে, 'তিনি বিচার দিনের মালিক'; তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে'। আল্লাহ আরো বলেন, 'বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সমর্পণ করেছে'। সে যখন বলে, 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি'; তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। (এখন) আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়'। যখন সে বলে, 'আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন। ওই সকল লোকদের পথে যাদেরকে আপনি নিআমাত দান করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে', তখন আল্লাহ বলেন, 'এসবই আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্যে রয়েছ সে যা চায়'।[৭৬]

সূরা বাকারা ও আলে ইমরানের ফযীলত

সূরা বাকারা সম্পর্কে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুটি সহীহ হাদীস উল্লেখ্য করা হল:

১। যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেখান থেকে শয়তান পলায়ন করে।

---

৭৬. সহীহ মুসলিম-৭৬৪

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِس".

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের ঘরসমূহকে কবরের মত করে রেখো না। কারণ, যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।[৭৭]

২। সূরা বাকারা ও আলে ইমরান কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসেবে আসবে। ছায়াদানকারী এসে পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে।

আবু উমামা বাহিলী থেকে বর্ণিত,

أَبُوْ أُمَامَةَ، الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: "اقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِه اقْرَءُوْا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوْا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ"

অর্থ: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফাআতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরা অর্থাৎ, সূরা বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান পড়। কিয়ামতের দিন এ দুটি সূরা এমনভাবে আসবে যেন তা দু'খণ্ড মেঘ অথবা দুটি ছায়াদানকারী অথবা দু'ঝাঁক উড়ন্ত পাখি; যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সূরা আল-বাকারা পাঠ কর। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বরকতের কাজ। পরিত্যাগ

৭৭. সহীহ মুসলিম-১৭০৯

করা পরিতাপের কাজ। আর বাতিলের অনুসারীগণ এর মোকাবেলা করতে পারে না।[৭৮]

আয়াতুল কুরসির ফযীলত

আয়াতুল কুরসী হল সূরা বাকারার ২৫৫ নাম্বার আয়াত। নিম্নে তা অর্থসহ উল্লেখ করা হল:

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে, সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না; যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন ততটুক ব্যতীত। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

আয়াতুল কুরসী'কে বলা হয় ইসলামের মৌলিক বিধান। এখানে খালেস আল্লাহর প্রভুত্বের ও তাওহীদের কথা বলা হয়েছে। এটাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ ধরা হয়। এই আয়াতটি আসমাউল হুসনা সম্বলিত। তাই এটাকে আমাদের সালাফ খালাফ বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সহীহ হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

৭৮. সহীহ মুসলিম-১৭৫৯

১। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِيْ أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ". قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ". قَالَ: قُلْتُ: اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. قَالَ: فَضَرَبَ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ: "وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ."

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল মুনযির! আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আবুল মুনযির বলেন, জবাবে আমি বললাম, এ বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, হে আবুল মুনযির! আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? তখন আমি বললাম, এ আয়াতটি আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ। এ কথা শুনে তিনি আমার বুকের উপর হাত মেরে বললেন, হে আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞানকে স্বাগতম।[৭৯]

২। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ: إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ

৭৯. সহীহ মুসলিম-১৭৭০

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ إِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ دَعْنِيْ فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُوْدُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ قَالَ دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ، قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ} حَتّٰى تَخْتِمَ الآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: مَا هِيَ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتّٰى تَخْتِمَ الآيَةَ {اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন,

আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দীকে কি করলে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীকে কী করলে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব, যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন

রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, ওই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুঁশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।[৮০]

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত হল–

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَآئِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلِه لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

---

৮০. তা'লিকে সহীহ বুখারী-২৩১১, সুনেন তিরমিযী-২৮৮০, সুনানে কুবরা-১০৭৯৫, শুআবুল ঈমান-২১৭০

অর্থ: রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। সে তাই পায়, যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায়, যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।[৮১]

সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে চারটি প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা হল:

১. আবু মাসউদ বাদরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা বাকারার শেষে এমন দুটি আয়াত রয়েছে যে ব্যক্তি রাতের বেলা আয়াত দুটি তেলাওয়াত করবে তার জন্য এ আয়াত দু'টোই যথেষ্ট। অর্থাৎ, রাতে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করার যে

---

৮১. সূরা বাক্বারা: ২৮৫-৮৬

হক রয়েছে, কমপক্ষে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলে তার জন্য তা যথেষ্ট।[৮২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, কেউ এ হাদীসের উপর আমল করলে তাঁর পুরো রাত কিয়ামুল লাইলের সাওয়াব পেয়ে যাবে।[৮৩]

২. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ.

অর্থ: তিনি বলেন, একদিন জিবরীল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজই এটি খোলা হল। ইতোপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এ দরজা দিয়ে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এ দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আপনি আপনাকে দেওয়া দু'টি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে তা দেওয়া হয়নি। আর ঐ দু'টি নূর হল সূরা ফাতেহা ও সূরা আল-বাকারার শেষাংশ। এর যে কোন হরফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেওয়া হবে।[৮৪]

---

৮২. সহীহ বুখারী-৪০০৮, সহীহ মুসলিম-৮০৭
৮৩. ফাতহুল বারী-৯/৫৬
৮৪. সহীহ মুসলিম-১৭৬২

৩. নু'মান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَا يُقْرَآنِ فِيْ دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ." قَالَ أَبُوْ عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন। সেই কিতাব হতে তিনি দু'টি আয়াত নাযিল করছেন। সেই দু'টি আয়াতের মাধ্যমেই সূরা আলবাকারা সমাপ্ত করেছেন। যে ঘরে দিন-রাত এ দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই ঘরের নিকট আসতে পারে না।[৮৫]

৪. হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ حُذَيْفَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: أُعْطِيْتُ هٰذِهِ الْأَيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتِ الْعَرْشِ، لَا يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِيْ.

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে সূরা বাকারার শেষের দুটো আয়াত দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাআলার আরশের নিচে থাকা ধনভাণ্ডার থেকে, যা ইতোপূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।[৮৬]

আল্লামা নূরুদ্দীন হায়ছামী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৮৭]

---

৮৫. সুনানে তিরমিযী-২৮৮২

৮৬. মুসনাদে আহমদ-২৩২৫১, সহীহ ইবনে খুযাইমা-২৬৩

৮৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৬/৩১৫

সূরা কাহাফের ফযীলত:

সূরা কাহাফ সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করছি:

হযরত বারা' ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُوْلُ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْكَهْفِ إِذْ رَأَى دَابَّتَهُ تَرْكُضُ فَنَظَرَ فَإِذَا مِثْلُ الْغَمَامَةِ أَوِ السَّحَابَةِ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ الْقُرْآنِ أَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ".

অর্থ: তিনি বলেন, একদা এক লোক সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিল। সে লোকটি হঠাৎ দেখতে পেল, তার পশুটি লাফাচ্ছে। সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেঘমালা বা ছায়ার মত কিছু দেখল। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে এ ঘটনা বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হল বিশেষ প্রশান্তি যা কুরআনের সাথে বা কুরআনের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।[৮৮]

সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতের ফযীলত

দাজ্জাল একটি ভয়ংকর ফেতনা। প্রত্যেক নবী-ই এ ফেতনা থেকে মুক্তি কামনা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মদীকে এ ফেতনা থেকে সতর্ক করত আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত তেলাওয়াত করলে দাজ্জল থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। এখানে দুটো হাদীস উল্লেখ করা হল:

---

৮৮. সহীহ মুসলিম-৭৯৫, সুনানে তিরমিযী-২৮৮৫

১. আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ."

অর্থ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিনটি আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে বিপদমুক্ত রাখা হবে।[৮৯]

আল্লামা নববী রহ. বলেন, এক রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত। উদ্দেশ্য হল, সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে আল্লাহ তাআলার নিদর্শন ও আযাবের কথা বর্ণিত আছে। কেউ এসব পাঠ করলে ঈমান মজবুত থাকবে এবং দাজ্জালের ফেতনায় পতিত হবে না।

আর শেষ দশ আয়াতে আল্লাহর বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের কথা বলা আছে। পাঠক তা পাঠ করলে সব ফেতনা থেকে মুক্তি পাবে।[৯০]

২. নাওওয়াস ইবনে সামআন রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا فَقَالَ: "مَا شَأْنُكُمْ". قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِيْ طَائِفَةِ النَّخْلِ. فَقَالَ: "غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِيْ عَلَيْكُمْ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُوْنَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيْفَتِيْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا

৮৯. সহীহ মুসলিম-৮০৯, সুনানে তিরমিযী-২৮৮৬
৯০. মিনহাজ-৬/৮২

وَعَاثَ شِمَالاً يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا". قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ قَالَ: "أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِه كَأَيَّامِكُمْ". قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَسَنَةٍ أَتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلاَةُ يَوْمٍ قَالَ: "لَا اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ". قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِيْ الْأَرْضِ قَالَ: "كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِيْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِه وَيَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِيْ الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا أَخْرِجِيْ كُنُوْزَكِ. فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ ثُمَّ يَدْعُوْ رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوْهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوْدَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِه إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِيْ لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِيْ إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُوْنَ مَا فِيْهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيْسٰى وَأَصْحَابُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ

اللهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِيْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ فَلَا يَجِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسٰى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتّٰى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّيْ بَرَكَتَكِ. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتّٰى يأَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ".

অর্থ: তিনি বলেন, একবার সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আলোচনার সময় তিনি তার ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেন। পরে অনেক গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করেন যাতে তাকে আমরা ঐ বৃক্ষরাজির নির্দিষ্ট এলাকায় (আবাসস্থল সম্পর্কে) ধারণা করতে লাগলাম। এরপর আমরা সন্ধ্যায় আবার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের মধ্যে এর প্রভাব দেখতে পেয়ে বললেন, তোমাদের ব্যাপার কি? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি সকালে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এতে আপনি কখনো ব্যক্তিত্বকে তুচ্ছ করে তুলে ধরেছেন, আবার কখনো তার ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলে ধরেছেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, দাজ্জাল বুঝি এ বাগার (জায়গার নাম) মধ্যেই বিদ্যমান। এ কথা শুনে তিনি বললেন, দাজ্জাল

নয়, বরং তোমাদের ব্যাপারে আমি অন্য কিছুর অধিক আশংকা করছি। তবে শোন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটে; তবে আমি নিজেই তাকে প্রতিহত করব। তোমাদের প্রয়োজন হবে না। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকাবস্থায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ হয়, তবে প্রত্যেক মু'মিন লোক নিজের পক্ষ হতে তাকে প্রতিহত করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আল্লাহ তাআলাই হলেন আমার পক্ষ হতে তত্ত্বাবধানকারী। দাজ্জাল যুবক এবং ঘন চুল বিশিষ্ট হবে, তার চোখ হবে আঙ্গুরের ন্যায়। আমি তাকে কাফির 'আব্দুল 'উযয়া ইবনু কাতান-এর মতো মনে করছি।

তোমাদের যে কেউ দাজ্জালের সময়কাল পাবে সে যেন সূরা আলকাহফ-এর প্রথমোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে। সে ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যপথ হতে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে দুর্যোগ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থাকবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল্লিশদিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যেদিন এক বছরের সমান হবে, সেটাতে এক দিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং তোমরা এদিন হিসাব করে তোমাদের দিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিবে। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দুনিয়াতে দাজ্জালের অগ্রসরতা কি রকম বৃদ্ধি পাবে? তিনি বললেন, বাতাসের প্রবাহ মেঘমালাকে যে রকম হাঁকিয়ে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি।

সে এক কওমের কাছে এসে তাদেরকে কুফরির দিকে ডাকবে। তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তার আহ্বানে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশসমূহকে আদেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে

এবং ভূমিকে নির্দেশ দিবে, ফলে ভূমি গাছ-পালা ও শস্য উৎপন্ন করবে। তারপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের চেয়ে বেশি লম্বা কুজ, প্রশস্ত স্তন এবং পেটপূর্ণ অবস্থায় তাদের কাছে ফিরে আসবে। তারপর দাজ্জাল অপর এক কওমের কাছে আসবে এবং তাদেরকে কুফরীর দিকে ডাকবে। তারা তার কথাকে উপেক্ষা করবে। ফলে সে তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবে।

অমনি তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও পানির অনটন দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে সেটাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন জমিনের ধন-ভাণ্ডার বের হয়ে তার চারপাশে একত্রিত হতে থাকবে, যেমন মধু-মক্ষিকা তাদের সর্দারের চারপাশে সমবেত হয়। অতঃপর দাজ্জাল এক যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তীরের লক্ষ্যস্থলের ন্যায় দু'টুকরো করে ফেলবে। তারপর সে আবার তাকে আহ্বান করবে। যুবক আলোকময় হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার সম্মুখে এগিয়ে আসবে।

এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আ.-কে প্রেরণ করবেন। তিনি দু'জন ফেরেশতার কাঁধের উপর ভর করে ওয়ারস ও জাফরান রং-এর জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশকের নগরীর পূর্ব দিকের উজ্জ্বল মিনারে অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা ঝুঁকাবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা পানি তাঁর শরীর থেকে মনি-মুক্তার ন্যায় গড়িয়ে পড়বে।

তিনি যে কোন কাফিরের কাছে যাবেন সে তাঁর শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে সন্ধান করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে 'বাবে লুদ' নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর হযরত ঈসা আ. ঐ সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন; যাদেরকে আল্লাহ তাআলা দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন।

ঈসা আ. তাদের কাছে গিয়ে তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের স্থানমূহের ব্যাপারে খবর দিবেন। এমন সময় আল্লাহ তাআলা ঈসা আ.-এর প্রতি এ মর্মে ওহী অবতীর্ণ করবেন যে, আমি আমার এমন বান্দাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছি, যাদের সঙ্গে কারওই যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। অতঃপর তুমি আমার মুমিন বান্দাদেরকে নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও। তখন আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ কওমকে পাঠাবেন। তারা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীর সব প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে।

তাদের প্রথম দলটি "বুহাইরায়ে তাবারিয়া"র (ভূমধ্যসাগর) উপকূলে এসে এর সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দিবে। তারপর তাদের সর্বশেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এ সমুদ্রে কোন সময় পানি ছিল কি? তারা আল্লাহর নবী ঈসা আ. এবং তাঁর সাথীদেরকে অবরোধ করে রাখবে। ফলে তাদের নিকট একটি বলদের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশ' দীনারের মূল্যের চেয়েও অধিক মূল্যবান প্রতিপন্ন হবে। তখন আল্লাহর নবী ঈসা আ. এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। ফলে আল্লাহ তাআলা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব পাঠাবেন।

তাদের ঘাড়ে এক প্রকার পোকা হবে। এতে একজন মানুষের মৃত্যুর মতো তারাও সবাই মরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপর ঈসা আ. ও তাঁর সঙ্গীগণ পাহাড় হতে জমিনে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু তারা অর্ধ হাত জায়গাও এমন পাবেন না যেখানে তাদের পঁচা লাশ ও লাশের দুর্গন্ধ নেই। অতঃপর ঈসা আ. এবং তাঁর সঙ্গীগণ পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা উটের ঘাড়ের মতো লম্বা এক ধরনের পাখি পাঠাবেন।

তারা তাদেরকে বহন করে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে কোন স্থানে নিয়ে ফেলবে। এরপর আল্লাহ এমন মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যার ফলে কাঁচা-পাকা কোন গৃহই আর অবশিষ্ট থাকবে না। এতে জমিন বিধৌত হয়ে উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর পুনরায় জমিনকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, হে জমিন! তুমি আবার শস্য উৎপন্ন করো এবং তোমার বারাকাত ফিরিয়ে দাও।

সেদিন একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর বাকলের নীচে লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বারাকাত হবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উটই একদল মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে, দুগ্ধবতী একটি গাভী একগোত্রীয় মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যথেষ্ট হবে দুগ্ধবতী একটি বকরী এক দাদার সন্তানদের (একটি ছোট গোত্রের) জন্য।

এ সময় আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত আরামদায়ক একটি বায়ু প্রেরণ করবেন। এ বায়ু সকল মুমিন লোকদের বগলে গিয়ে লাগবে এবং সমস্ত মুমিন মুসলমানদের রূহ কবয করে নিয়ে যাবে। তখন একমাত্র মন্দ লোকেরাই এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। তারা গাধার ন্যায় পরস্পর প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।[৯১]

সূরা ইয়াসীনের ফযীলত

সূরা ইয়াসীন কুরআনের অন্যান্য সূরার মতই একটি সূরা। কুরআনের প্রত্যেকটি সূরা ও আয়াতই বরকতপূর্ণ।

সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশই প্রচলিত জাল-হাদীস। সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে বিশেষভাবে সহীহ সনদে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে হাসান স্তরের কিছু রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। এখানে কিছু রেওয়ায়েত উল্লেখ করছি:

১. মা'কিল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত,

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِقْرَؤُوْا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ".

অর্থ: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তির কাছে কুরআন তেলাওয়াত কর"।[৯২]

হাদীসের হুকুম: ইবনে হিব্বান ও আল্লামা হাকেম রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৯৩] আল্লামা সুয়ূতি রহ. হাসান বলেছেন।[৯৪] আল্লামা

---

৯১. সহীহ মসলিম-৭২৬৩

৯২. সহীহ ইবনে হিব্বান-৩০০২, আবু দাউদ-৩১২১, ইবনে মাজাহ-১৪৪৮

৯৩. মুস্তাদরাকে হাকেম-১/৫৬৫

৯৪. জামে' ছাগির

নববী রহ. আল আযরাকে ও আল্লামা যাহাবী রহ. মিযানুল ই'তিদালে হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[৯৫]

২. হযরত আবু হুরায়রা রহ. থেকে বর্ণিত:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ يس فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهٗ

অর্থ: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দিন ও রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৯৬] আল্লামা নূরুদ্দীন হায়ছামী রহ. হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[৯৭]

সূরা ওয়াকিয়ার ফযীলত

১. হযরত আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ؟ قَالَ: شَيَّبَتْنِيْ الْوَاقِعَةُ وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ} وَ {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}.

অর্থ: তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো খুব দ্রুত চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ওয়াকিয়াহ, আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ইযাশশামসু কুওইরাত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।[৯৮]

আল্লামা তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।[৯৯]

আল্লামা নূরুদ্দীন হায়ছামী রহ. হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[১০০]

---

৯৫. আল আযকার-১৯২, মিযানুল ই'তিদাল-৪/৫৫০
৯৬. মু'জামে ছাগির ও আওসাত লিত-তাবরানী-৪১৭
৯৭. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-১১২৯৭
৯৮. ত্বাবরানী-৮২৬৯
৯৯. তিরমিযী-৩২৯৭
১০০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-১১৩৯৩

২. ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تَصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا) وَكَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ بِأَمْرِ بَنَاتِه يقْرَأنِ بِهَا فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়াহ তেলাওয়াত করবে তাকে কখনো দরিদ্রতা স্পর্শ করবে না। রাবী বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. তাঁর মেয়েদেরকে প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করার আদেশ দিতেন।[১০১]

সূরা মুলকের ফযীলত

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتّٰى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ "تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ"

অর্থ: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআনের ত্রিশটি আয়াত এমন রয়েছে যা তেলাওয়াতকারীর জন্য মাফ হওয়া পর্যন্ত শাফায়াত করতে থাকে। আর তা হল সূরা মুলক।[১০২]

হাদীসটির হুকুম:

আল্লামা তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১০৩]

---

১০১. শুআবুল ঈমান-২৪৯৭, তাখরিজু আহাদিসুল কাশশাফ লিয-যায়লায়ী-১২৯৫

১০২. আবু দাউদ-১৪০০, তিরমিযী-২৮৯১, ইবনে মাজাহ-৩৭৮৬, দারামী-৩৪৫৬, মুসনাদে আহমদ-৭৯৭৫, সহীহ ইবনে হিব্বান-৭৮৭, মুস্তাদরাকে হাকেম-২০৭৫

১০৩. তিরমিয- ২৮৯১

আল্লামা নূরুদ্দীন হায়ছামী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১০৪]
শায়খ আহমদ শাকের রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১০৫]
আল্লামা ইবনুল মুলাক্কিন রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১০৬]

২. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِيْ قَلْبِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَعْنِيْ ﴿تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

অর্থ: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আশা করি আমার উম্মতের সকলের কলবে "সূরা মুলক তথা তাবারাকাল্লাযি বিয়াদিহীল মুলক" সূরাটি মুখস্থ থাকবে।[১০৭]

সূরা নাবা'র ফযীলত

১. হযরত আবু বকর রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ؟ قَالَ: شَيَّبَتْنِيْ الْوَاقِعَةُ وَ {عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ} وَ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾.

অর্থ: তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো খুব দ্রুত চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূরা ওয়াকিয়াহ, আম্মা ইয়াতাসাআলুন ও ইযাশশামসু কুওয়িরাত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।[১০৮]

আল্লামা তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন।[১০৯]
আল্লামা নুরুদ্দীন হায়ছামী রহ. হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।[১১০]

---

১০৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-১১৪৩০
১০৫. তাহক্বীকে মুসনাদে আহমদ-১৫/১২৯
১০৬. আল বাদরুল মুনির-৩/৫৬১
১০৭. মুজামে কাবীর লিত ত্বাবরানী-১১৬১৬
১০৮. ত্বাবরানী-৮২৬৯
১০৯. তিরমিযী-৩২৯৭
১১০. মাজমাউয যাওয়ায়েদ-১১৩৯৩

সূরা কাফিরূনের ফযীলত

মুহাজির সায়েগ থেকে বর্ণিত,

عَنْ مُهَاجِرِ الصَّائِغِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، قَالَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ وَسَمِعَ آخَرَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ غُفِرَ لَهُ.

অর্থ: এক ব্যক্তি সূরা কাফিরূন পাঠ করছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে শিরক থেকে মুক্ত। আরেক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সকল গুণাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।[১১১]

সূরা ইখলাসের ফযীলত

ইখলাস শব্দের অর্থ হল আন্তরিকতা, একনিষ্ঠ করা। আল্লামা ইবনে উসাইমিন বলেন, এই সূরাকে ইখলাস নামে নামকরণ করা হয়েছে, কারণ এতে একমাত্র আল্লাহর একত্বের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার গুণাগুণ ও তার মাহাত্ম্যের আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে সূরা ইখলাস সম্পর্কে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করছি-

১। আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ" قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ: "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ"

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে সক্ষম? সবাই জিজ্ঞেস করল, এক রাতে কুরআনের এক

১১১. মুসনাদে আহমদ-১৬৬৬৮, সুনানে দারেমী-৩৪৮৯, সুনানে কুবরা-১০৫৪১

তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়ব? তিনি বললেন, "কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ" সূরাটি কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।[১১২]

২। আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ-قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبِرُوْهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে অভিযানে পাঠালেন। সালাতে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন সূরা ইখলাস দিয়ে সালাত শেষ করতেন। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ব্যাপারটি আলোচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করো কেন সে এ কাজটি করেছে? এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, এ সূরাটিতে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী রয়েছে। এ জন্য সূরাটি পড়তে আমি ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ্ তাঁকে ভালবাসেন।[১১৩]

৩. আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ الْقُرْآنِ"

অর্থ: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সমগ্র কুরআন মাজীদকে তিনটি অংশে ভাগ

১১২. সহীহ বুখারী-৫০১৫, সহীহ মুসলিম-১৭৭১
১১৩. সহীহ বুখারী-৭৩৭৫, সহীহ মুসলিম-৮১৩

করেছেন আর "কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ" (সূরা ইখলাস)-কে একটি অংশ বলে নির্দিষ্ট করেছেন।[১১৪]

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "احْشِدُوْا فَإِنِّيْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ". فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّيْ أُرَى هٰذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِيْ أَدْخَلَهُ. ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنِّيْ قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ."

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা এক জায়গায় একত্রিত হও। কারণ আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাদেরকে কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। সুতরাং যাদের একত্রিত হওয়ার তারা একত্রিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে আসলেন এবং "কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ" সূরাটি পড়লেন। তারপর তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তখন আমরা একে অপরকে বলতে থাকলাম, আমার মনে হয় আসমান থেকে কোন খবর এসেছে আর সে জন্যই তিনি ভিতরে প্রবেশ করেছেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে বললেন, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদেরকে কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করে শোনাব। জেনে রাখ এটি (সূরা ইখলাস) কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান।[১১৫]

উপরোক্ত চারটি হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সূরা ইখলাস কুরআনের একতৃতীয়াংশের সমপর্যায়ের। সুতরাং কেউ সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করলে আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তাকে পুরো কুরআন শরীফ খতমের সাওয়াব দান করবেন।

---

১১৪. সহীহ মসলিম-১৭৭২
১১৫. সহীহ মুসলিম-১৭৭৩

৫. সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন।

মুহাজির সায়েগ থেকে বর্ণিত,

عَنْ مُهَاجِرِ الصَّائِغِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَعْنِيْ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، قَالَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ وَسَمِعَ آخَرَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَقَالَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ غُفِرَ لَهُ.

অর্থ: এক ব্যক্তি সূরা কাফিরূন পাঠ করছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে শিরক থেকে মুক্ত। আরেক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার সকল গুণাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।[১১৬]

সূরা ফালাক ও সূরা নাসের ফযীলত:

১। উকবাহ্ ইবনু আমির রাযি. থেকে বর্ণিত-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}"

অর্থ: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, আজ রাতে যে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর মতো মর্যাদায় আর কখনো দেখা যায় নি। সেগুলো হল- "কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক" (সূরা আল ফালাক) এবং "কুল আ'উযু বিরব্বিন্নাস" (সূরা আন্ নাস)-এর আয়াত।[১১৭]

২। আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾

১১৬. মুসনাদে আহমদ-১৬৬৬৮, সুনানে দারেমী-৩৪৮৯, সুনানে কুবরা-১০৫৪১
১১৭. সহীহ মুসলিম-১৭৭৬

وَ ﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِه وَوَجْهِه وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

অর্থ: তিনি বলেন প্রতি রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দুটো হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন।[১১৮]

৩। আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِه نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِه لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِيْ.

অর্থ: তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি 'মু'আব্‌বিযাত' সূরাগুলো পড়ে তাকে ফুঁক দিতেন। পরবর্তীতে তিনি যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলেন তখন আমি তাকে ফুঁক দিতে লাগলাম এবং তাঁরই হাত দিয়ে তাঁর দেহটি মুছে দিতে লাগলাম। কেননা আমার হাতের তুলনায় তাঁর হাতটি ছিল অনেক বারাকাতপূর্ণ। আর ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব রহ. 'মু'আব্‌বিযাত' দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতেন।[১১৯]

কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ

কুরআন হল আল্লাহ তাআলার কালাম। তিনি তা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। এ কুরআন অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের হেদায়াতের প্রদীপ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তবে এ আলকুরআনের

---

১১৮. সহীহ বুখারী-৫০১৭
১১৯. সহীহ মুসলিম-৫৬০৭

অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি সর্বকালের সর্বজনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এটি কোন ধরনের পরিবর্তন পরিমার্জন থেকে মুক্ত। এ বৈশিষ্ট্যদ্বয় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসূহের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আদব অর্থ শিষ্টাচার। নিশ্চয় সর্বোচ্চ শিষ্টাচার হল রাব্বুল আলামীন আল্লাহর সাথে শিষ্টাচার লক্ষ্য রাখা। কুরআন আল্লাহর কালাম। সুতরাং কুরআনের সাথে আদব রক্ষা করে চলা আল্লাহ তাআলার সাথে আদব লক্ষ্য রাখার নামান্তর। নিম্নে আমি কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব আদব রক্ষা রাখা জরুরি তা উল্লেখ করছি।

কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বশর্ত

১. ওযু করে পবিত্রতা অর্জন করা। কুরআন পাঠের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা জরুরি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ - فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ- لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

অর্থ: নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন যা আছে এক সুরক্ষিত কিতাবে। পাক-পবিত্রতা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না।[১২০]

তবে কেউ যদি কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে মুখস্থ তেলাওয়াত করতে চায় তাহলে তার জন্য ওযু ছাড়াও তেলাওয়াত করার অবকাশ আছে। তবে ওযু ছাড়া তেলাওয়াত না করাই শ্রেয়।

২. সুন্দর পোশাক পরিধান করা।

৩. কিবলামুখী হয়ে বসা।

৪. মনকে হাযির রেখে মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠের প্রস্তুতি নেওয়া।

৫. পূত পবিত্র স্থানে বসা।

৬. মিসওয়াক করা: কুরআন পাঠের পূর্বে মিসওয়াক করা উচিত।

১২০. সূরা ওয়াকিয়াহ-৭৭-৭৮-৭৯

৭. কুরআন তিলাওয়াতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ পড়াঃ কুরআন তেলাওয়াত করার শুরুতে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। এর মাধ্যমে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অর্থ: যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে পানাহ চাও।[১২১]

কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ:

১. মনোযোগ সহকারে কুরআনের মর্ম বুঝে পাঠ করা।
২. কুরআন নিয়ে গবেষণা করা : কুরআন সম্পর্কে গবেষণা বা ইজতিহাদ করার নির্দেশ আছে। আমরা মুসলিম জাতি কুরআন ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে আছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو الأَلْبَابِ.

অর্থ: আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে ।[১২২]

এ বিষয়ে হাদীসে আছে, হযরত উবায়দা মুলাইকী রাযি. বলেন, আর তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানাবে না। রাত-দিন কুরআন ভালোভাবে বুঝেশুনে তেলাওয়াত করবে এবং তা প্রকাশ করবে ও সুর করে পড়বে; অধিকন্তু কুরআনে যা আছে সেসব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্রই এটার প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না। কেননা, কুরআনের প্রতিফল রয়েছে।[১২৩]

---

১২১. সূরা আন-নাহল: ৯৮
১২২. সোয়াদ: ৪৪
১২৩. বায়হাকী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২০৯৯

৩. তারতীলের সাথে কুরআন পাঠ করা: এর অর্থ কুরআন শুদ্ধভাবে মাখরাজ অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করা। এ ব্যাপারে কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا.

অর্থ: তোমরা তারতীলের সঙ্গে তথা ধীরস্থিরভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর।[১২৪]

বিসমিল্লাহ পড়া: তেলাওয়াতকারীর উচিত সূরা তাওবাহ ব্যতীত সকল সূরার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়া।

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সূরা শেষ করে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করে আরেক সূরা শুরু করতেন।[১২৫]

৪. নিয়মিত পাঠ করা: কুরআন নিয়মিত পাঠ করা উচিত।

৫. কুরআন পাঠ করে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা : কুরআন পাঠ করে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَعَاهَدُوْا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِه لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِيْ عُقُلِهَا.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কুরআনের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! কুরআন বাঁধন ছাড়া উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে দৌড়ে যায় (ইয়াদ না করলে দ্রুত ভুলে যাবে)।[১২৬]

---

১২৪. সূরা মুযযাম্মিল-৪
১২৫. বাযযার, হা/৪৯৭৯
১২৬. সহীহ বুখারী-৫০৩৩

অপরের তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকা: কুরআন তিলাওয়াতের সময় চুপ থাকা এবং মনোযোগ সহকারে শুনা। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

অর্থ: 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর।[১২৭]

৬. কুরআন পাঠের সময় আল্লাহর ভয় থাকা: কুরআন পাঠের সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা উচিত। এ বিষয়ে তাবেয়ী হযরত তাউস (ইয়ামানী) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনের স্বর প্রয়োগ ও ভালো তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার কুরআন পাঠ তোমার কাছে মনে হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করছে। তাউস বলেন, তাবেয়ী তালক এরূপ ছিলেন।[১২৮]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কুরআন তিলাওয়াতের সর্বোত্তম কণ্ঠ সে ব্যক্তির, যার তেলাওয়াত কেউ শুনলে মনে হয় সে কাঁদছে।[১২৯]

এ ছাড়া অনেক সাহাবীর জীবন থেকে জানা যায় যে, তাঁরা জাহান্নামের আয়াত আসলে ক্রন্দন করতেন। এমনকি সালাত আদায় করতে করতেও ক্রন্দনের বিষয়ে বুখারীতে তালীক রয়েছে।

৭. ছাওয়াবের আয়াত আসলে থামা এবং উক্ত সাওয়াব আল্লাহর কাছে চাওয়া। পক্ষান্তরে শাস্তির আয়াত আসলে তা থেকে মাফ চাওয়া।

৮. কুরআন পড়ে আমল করা: কুরআন পাঠ শুধু জানার জন্য নয়, কুরআন অনুযায়ী আমল করতে হবে। কুরআনের আদেশ ফরয

---

১২৭. আরাফ: ২০৪

১২৮. সুনানে দারেমী, মিশকাত হাদীস নং-২০৯৭

১২৯. ইবন মাজাহ, হাদীসং-১৩৩৯

হিসেবে আমল করতে হবে এবং নিষেধকে হারাম হিসেবে পরিত্যাগ করতে হবে।

৯. কুরআন শিক্ষা করে ভুলে না যাওয়া: কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। এ ব্যাপারে আবু দাউদ ও দারেমীতে উল্লেখিত, যে কুরআন ভুলে যায় সে কিয়ামতের দিন অঙ্গহীনরূপে উঠবে।

১০. মনের সন্তুষ্টি পরিমাণ কুরআন পাঠ করা : যতক্ষণ মনের সন্তুষ্টি থাকে ততক্ষণ কুরআন পাঠ করা উচিত। জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন পড়, যতক্ষণ তোমাদের মন পড়তে চায়। আর যখন মনের ভাব অন্যরূপ দেখ, তখন উঠে যাও।

১১. সিজদার আয়াত পাঠ করলে সিজদা দেওয়া: কুরআন পাঠ করতে করতে সিজদার আয়াত আসলে তা পাঠ করে সিজদা করা উচিত। এটি ওয়াজিব কিনা তা নিয়ে মতভেদ হলেও এ ব্যাপারে অসংখ্য সাহাবীর আমল বিদ্যমান। কেউ কেউ সিজদার আয়াত আসলে এড়িয়ে যান এটা ঠিক নয়। ফুকাহায়ে কেরাম সিজদার আয়াত পড়ার পরে পরবর্তী সময়ে সিজদা দেওয়া যাবে বলে অভিমত দিয়েছেন। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেওয়ার সময় সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর সিজদা দিলেন, তার সাথে আমরাও সিজদা করলাম।[১৩০]

১২. হাই উঠলে কুরআন পড়া বন্ধ করা।

১৩. কুরআন খুলে না রাখা এবং তার উপরে কিছু চাপিয়ে না রাখা।

১৪. অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন উচ্চ আওয়াজে কুরআন না পড়া।[১৩১]

---

১৩০. ইবনু খুযাইমাহ, হাদীস নং-১৪৫৫

১৩১. ইতকান-২২০, মুহাযারাত-১০১, মাবাহিছ,

অতএব সম্মানিত পাঠক! আপনার সময়ের নির্দিষ্ট অংশ কুরআন পাঠের জন্য নির্ধারণ করুন। যত ব্যস্তই থাকুন না কেন ঐ অংশটুকু পড়ে নিতে চেষ্টা করুন। কেননা যে কাজ সর্বদা করা হয় তা অল্প হলেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশি কাজ করার চাইতে উত্তম।

কুরআন পড়ে বিনিময় নেওয়ার বিধান

কুরআন শিখা ও শিখানো উভয়টি ফরযে কেফায়া। যারা এই কাজের সাথে জড়িত তাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ উপাধি দেওয়া হয়েছে। উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অর্থ: যারা কুরআন শিখে ও শিখায় তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।[১৩২]

কুরআন হিফয করে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। যাতে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মত কুরআন পরিবর্তন না হয়। মুতাওয়াতির সনদে সর্বকালে তা প্রচলিত থাকে। আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত এমনটিই হয়ে আসছে। এটা ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য। কুরআনের মুজেযা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থ: আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[১৩৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم.

অর্থ: আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা।[১৩৪]

আল্লামা আবুল লাইছ সামারকান্দী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বুসতানুল আরিফীন-এ লিখেছেন।

---

১৩২. সহীহ বুখারী-৫০২৭

১৩৩. সূরা হুজর,

১৩৪. সূরা ইউনুস-৬৪

কুরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণের বিধান:

আল্লামা আবুল লাইছ সমরকন্দী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বুসতানুল আরিফীন-এ বলেন,

কুরআন তিন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়:

১. কোন পারিশ্রমিক ছাড়া সাওয়াবের নিয়তে। এটা জায়েয বরং মুস্তাহাব ও প্রশংসনীয়। এটি নবীদের সুন্নত।

২. কোন প্রকার শর্ত ছাড়া কুরআন পড়া বা পড়ানো। হাদিয়া আসলে গ্রহণ করেন অন্যথায় সবর করেন। এটাও বৈধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরো পৃথিবীর শিক্ষক ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া দিতেন। তিনি তা সাদরে গ্রহণ করতেন।

৩. পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া বা পড়ানো। এটি মতানৈক্য পূর্ণ একটি মাসআলা।

আমরা এখানে তৃতীয় সুরতের বিধানটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করবো। এটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

মাযহাবসমূহ:

কুরআন শরীফ পড়ে বা পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধতার ব্যাপারে দু'টি মত প্রসিদ্ধ।

১. জমহুর উলামায়ে কেরাম যথা ইমাম শাফী রহ. ও ইমাম মালেক রহ. বলেন, কুরআন শরীফ পড়ে বা পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ।

২. ইমাম আবু হানিফ রহ. বলেন, কুরআন শরীফ পড়ে বা পড়িয়ে বিনিময় নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। তা জায়েয নেই।

উভয় পক্ষের দলিলসমূহ:

১। জমহুর উলামায়ে কেরাম তথা ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম মালেক রহ.-এর দলিল:

○ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيْغٌ أَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِه، فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوْا الْمَدِينَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের একটি দল একটি কুয়ার পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। কূপের পাশে অবস্থানকারীদের মধ্যে ছিল সাপে কাটা এক ব্যক্তি কিংবা তিনি বলেছেন, দংশিত এক ব্যক্তি। তখন কূপের কাছে বসবাসকারীদের একজন এসে তাদের বলল, আপনাদের মধ্যে কি কোন ঝাড়-ফুঁককারী আছেন? কূপ এলাকায় একজন সায়ী বা বিচ্ছু দংশিত লোক আছে। তখন সাহাবীদের মধ্যে একজন সেখানে গেলেন। এরপর কিছু বকরী দানের বিনিময়ে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন। ফলে লোকটির রোগ সেরে গেল। এরপর তিনি ছাগলগুলো নিয়ে সাথীদের নিকট আসলেন, কিন্তু তাঁরা কাজটি পছন্দ করলেন না। তাঁরা বললেন, আপনি আল্লাহর কিতাবের পারিশ্রমিক নিয়েছেন। অবশেষে তাঁরা মদীনায় পৌঁছে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি আল্লাহর কিতাবের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করেছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সকল জিনিসের উপর তোমরা বিনিময় গ্রহণ করে থাক, তন্মধ্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার সবচেয়ে বেশি হক রয়েছে আল্লাহর কিতাবের।[১৩৫]

---

১৩৫. সহীহ বুখারী-৫৭৩৭

○ সাহল ইবনে সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত,

سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ: مَا عِنْدِيْ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ؟ قَالَ: وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلٰكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِيْ هٰذِهِ فَأُعْطِيْهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ قَالَ: لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

অর্থ: তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন মহিলা এসে নিজেকে পেশ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আপাদমস্তক ভাল করে দেখলেন; কিন্তু তার কথার কোন উত্তর দিলেন না। একজন সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে কি? লোকটি উত্তরে বলল, না, আমার কাছে কিছু নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই? লোকটি উত্তর করল, না, আমার একটি লোহার আংটিও নেই। কিন্তু আমি আমার পরিধানের তহবন্দের অর্ধেক তাকে দেব আর অর্ধেক নিজে পরব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তোমার কুরআন মাজীদের কিছু জানা আছে? সে বলল, হ্যাঁ। নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার পরিবর্তে আমি তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।[১৩৬]

হাদীসটি দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত সাহাবীকে কুরআনের বিনিময়ে বিয়ে দিয়েছেন। কুরআনকে তার পক্ষ থেকে দেন মহর হিসেবে ধার্য্য করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল কুরআনকে কোন কিছুর বিনিময় বানানো বৈধ।

১৩৬. সহীহ বুখারী-৫১৩২

হানাফী মাযহাবের দলিলসমূহ:

○ হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدٰى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِيْ عَنْهَا فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآتِيَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَلأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَجُلٌ أَهْدٰى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِيْ عَنْهَا فِيْ سَبِيلِ اللهِ. قَالَ: "إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا."

অর্থ: তিনি বলেন, আমি আহলে সুফফার কতিপয় ব্যক্তিকে কুরআন পড়া ও লিখা শিখাতাম। তাদের একজন আমাকে উপহার হিসেবে একটি ধনুক পাঠালো। আমি বললাম, এটা কোন সম্পদ নয়। আমি এটা দিয়ে আল্লাহর পথে তীর ছুঁড়বো; কিন্তু আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। অতঃপর আমি তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক লোক আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে। আমি লোকদের সঙ্গে তাকেও লিখা এবং কুরআন শিখাতাম। ধনুকটা (মূল্যবান) সম্পদ নয়। আমি এটা দিয়ে আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর ছুঁড়বো। তিনি বলেন, তুমি যদি গলায় জাহান্নামের শিকল পরতে চাও, তাহলে তা গ্রহণ করো।[১৩৭]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"اِقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوْا بِه"

অর্থ: কুরআন পড়ো। এর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করো না।[১৩৮]

---

১৩৭. সুনানে আবু দাউদ-৩৪১৬

১৩৮. মুসনাদে আহমদ-৩/৪২৮

সংশ্লিষ্ট মাসআলায় হানাফী পরবর্তী স্কলারদের অবস্থান:

পৃথিবীজুড়ে যখন ইসলামের পতাকা উড়ছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে সবাই ইসলামের সুশীল ছায়াতলে আসতে শুরু করলো। ইসলাম মানেই শান্তি। যে ইসলাম সম্পর্কে জানবে সে মুগ্ধ হবেই। একটা সময় সাহাবা তাবেয়ী কেরামগণ অর্ধ ভুবন শাসন করেন।

আজমীদের অনেক দেশ ইসলামী খেলাফতের ছায়ায় আসতে শুরু করে। আজমীদের ভাষা যেহেতু আরবী নয় তাই তাদের কুরআন বুঝতে কঠিন হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ সাপেক্ষে কারী সাহাবাদেরকে একেক দেশে একেক জনকে পাঠান। তাদের কাজই হল, অনারবী নতুন মুসলিম ভাইদেরকে সহীহ ভাবে কুরআন শিক্ষা দেওয়া।

খুলাফায়ে রাশিদীন তখন তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। যাতে কারীগণ পারিবারিক প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

হানাফী মাযহাবের কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া নিষেধ তখনকার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী খেলাফত নেই। নেই ইসলামী শাসন তাই কারী সাহেবদের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কোন বেতন নেই।

বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুতাআখিরীনগণ ভাবতে শুরু করেন। আল্লামা শামী রহ.সহ অনেক হানাফী স্কলারগণ জরুরতের কারণে কুরআন পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন। যাতে কুরআন পড়ানেওয়ালার সংকটের কারণে কুরআন বিনষ্ট হয়ে না যায়।

আযান, ইমামতি ও ফিকহ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান। আমি এখানে আল্লামা শামী রহ.-এর ইবারতটি তুলে ধরছি,

اَلْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوْزُ الْاِسْتِئْجَارُ عَلَيْهَا عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {اِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ} وَفِيْ آخَرِ مَا عَهِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ {وَإِنْ اُتُّخِذْتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذْ عَلَى الْأَذَانِ

أَجْرًا} وَلِأَنَّ الْقُرْبَةَ مَتَى حَصَلَتْ وَقَعَتْ عَلَى الْعَامِلِ وَلِهٰذَا تَتَعَيَّنُ أَهْلِيَّتُهُ، فَلَا يَجُوْزُ لَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِيْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

قَالَ فِيْ الْهِدَايَةِ: وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا -رحمهم الله- اِسْتَحْسَنُوْا الْاِسْتِئْجَارَ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ لِظُهُوْرِ التَّوَانِيْ فِيْ الْأُمُوْرِ الدِّيْنِيَّةِ، فَفِي الْاِمْتِنَاعِ تَضْيِيْعُ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى.

অর্থ: মূলনীতি হল, মুসলিমদের সাথে বিশেষিত এমন ইবাদতের পারিশ্রমিক নেওয়া আমাদের মাযহাবে জায়েজ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কুরআন পড়ো। এর বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. সর্বশেষ নসিহত করেন, “মুআজ্জিনের দায়িত্ব পেলে তুমি এর বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করো না”। কিয়াসী দলিল হলো, পুণ্যময়ী কোন আমল করলে ছাওয়াব স্বয়ং আমলকারী পায় তাই অন্যকারও থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা যাবে না। যেমন নামাজ রোজার ক্ষেত্রে।

কিন্তু হানাফী মাযহাবের কতক মাশায়েখ কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়াকে সূক্ষ্ম দলিলের মাধ্যমে জায়েজ বলেছেন। কেননা, দ্বীনি বিষয়ে মানুষদের থেকে অলসতা পরিলক্ষিত হয়েছে সুতরাং না-জায়েজ ফতোয়া দিলে কুরআন শেখা-শেখানো বাধাগ্রস্ত হবে। সমকালীন সময়ে ফতোয়া এটাই।[১৩৯]

গানের ন্যায় স্বর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করার বিধান

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম, কোমল স্বরে সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, কুরআন সাজিয়ে স্বর দিয়ে পড়া মুস্তাহাব। যদি তা তাজবীদ শাস্ত্রের ও আরবী ভাষাভাষিদের প্রচলিত কায়দা-কানুনের ভিত্তিতে হয়।

১৩৯. আল হিদায়া, বাবুল ইজারাতিল ফাসিদা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মুসা আশআরী রাযি. কে বলেন,

"لَقَدْ أُوْتِيْتُ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُوْدَ"

অর্থ: তুমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দাউদ আ.-এর স্বরের ন্যায় মধুর স্বর প্রদত্ত হয়েছ।[১৪০]

বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﷺ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْعِشَاءَ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ."

অর্থ: "একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা তীন দিয়ে এশার নামাজের ইমামতি করলেন। (রাবী বলেন) তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে অধিক সুন্দর স্বর আর কারও থেকে শুনিনি। (সুবহানাল্লাহ)।"[১৪১]

অন্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

فِيْ أَبِيْ دَاوُوْدَ وَالْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ"

অর্থ: তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা স্বর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করো। যে স্বর দিয়ে তেলাওয়াত করবে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১৪২]

এসব হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর দিয়ে কুরআন পড়তেন। তিনি মধুর স্বরের অধিকারী ছিলেন। স্বর দিয়ে যারা তেলাওয়াত করতেন তাদেরকে তিনি প্রশংসা করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে স্বর দিয়ে কোমলভাবে তেলাওয়াত

১৪০. সহীহ বুখারী-৪৭৬১
১৪১. সহীহ বুখারী-৭৩৫, সহীহ মুসলিম-৪৬৪
১৪২. আবু দাউদ-১৪৬৮, তা'লীকে বুখারী-২৭৪৩

করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তবে এসব তখনই প্রশংসনীয়, যদি তা হয় তাজবীদ শাস্ত্রের শর্তানুযায়ী।

অতি মাত্রায় স্বর দেওয়া, তাজবীদ শাস্ত্রের কায়দা-কানুন লক্ষ্য না রাখা এবং প্রচলিত গানের মত স্বর দিয়ে তেলাওয়াতে অতিরঞ্জন করা হাদীসে নিষেধ এসেছে। এসব বেদআত। এসব কাম্য নয়।

এমনভাবে তেলাওয়াত করা যাতে কুরআনের মদ, গুন্নাহ ও হরফ অস্পষ্ট থাকে অথবা কুরআনের স্বর দিতে ভান করা ইত্যাদি হারাম।

আল্লামা মাওয়ারদী রহ. বলেন,

فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْأَلْحَانِ الْمَوْضُوعَةِ فَإِذَا أُخْرِجَتْ أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ عَنْ صِيْغَتِهِ، بِإِدْخَالِ حَرَكَاتٍ فِيهِ وَإِخْرَاجِ حَرَكَاتٍ مِنْهُ، يُقْصَدُ بِهَا وَزْنُ الْكَلَامِ وَانْتِظَامُ اللَّحْنِ، أَوْ مَدُّ مَقْصُورٍ، أَوْ قَصْرُ مَمْدُودٍ، أَوْ مَطَّ حَتَّى يَخْفِيَ اللَّفْظُ، وَالْتَبَسَ الْمَعْنَى، فَهٰذَا مَحْظُورٌ، يُفَسَّقُ بِهِ الْقَارِئُ، وَيَأْثَمُ بِهِ الْمُسْتَمِعُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَدَلَ بِه عَنْ نَهْجِه إِلٰى اِعْوِجَاجِه، وَاللهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ: قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ (الزُّمَرِ).

وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ اللَّحْنُ عَنْ صِيغَةِ لَفْظِه وَقِرَاءَتِه عَلٰى تَرْتِيلِه كَانَ مُبَاحًا، لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ بِأَلْحَانِه فِيْ تَحْسِينِه.

অর্থ: বানোয়াট স্বরে তেলাওয়াত করার কারণে যদি কুরআনের শব্দ তার স্বরূপ থেকে বের হয়ে যায় বা অতিরিক্ত হরকত ঢুকে যায় বা বের হয়ে যায় (এটা দ্বারা উদ্দেশ্যই হয় স্বরকে সুন্দর করা) কিংবা মদ্দকে বিলুপ্ত করে পড়া বা মদ্দ নেই এমন স্থানে মদ্দসহ পড়া অথবা স্বরকে এত প্রসারণ করে তেলাওয়াত করা, যার ফলে কোন শব্দ বা অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে এসব করা নিষিদ্ধ। এসব করলে কারী ফাসেক হিসেবে বিবেচিত হবে। যে শ্রবণ করবে সেও গুণাহগার হবে। কেননা, কারী সাহেব কুরআনকে তার মূল অবস্থা থেকে বিকৃতি

করে, বক্র করে তেলওয়াত করেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, "কুরআন বক্র নয়"।

অবশ্য কারী সাহেব যদি কুরআনের শব্দ ও অর্থকে ঠিক রেখে নিয়মানুযায়ী অতিরিক্ত স্বর দিয়ে পাঠ করে তাহলে তা তার জন্য বৈধ। কেননা, সে তো কেবল কুরআনকে কোমলভাবে সুন্দর করে তেলাওয়াত করতে চেয়েছে।[১৪৩]

আল্লামা রাফে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইজাজুল কুরআনে বলেন, "বর্তমান সময়ে অতি মাত্রায় স্বর দিয়ে অতিরঞ্জন করার যে প্রবণতা দেখা যায় তা বর্জনীয়"।

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِقْرَؤُوْا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَأَهْلِ الْفِسْقِ فَإِنَّهُ سَيَجِيْءُ بَعْدِيْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ، وَقُلُوْبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.

অর্থ: তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আরববাসীদের প্রচলিত স্বরে কুরআন পড় এবং আহলে কিতাব ও ফাসেকদের স্বর পরিহার করো। জেনে রেখো! আমার পরে একদল সম্প্রদায় আসবে যারা গান-বাদ্য, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীর মত কুরআনকে চর্বণ করে পাঠ করবে। তাদের তেলাওয়াত তাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছাবে না। কিছু লোককে তাদের বিষয় মুগ্ধ করবে।"[১৪৪]

---

১৪৩. হালবী কাবীর, অধ্যায় যার সাক্ষ্য গ্রহণ যাবে
১৪৪. মু'জামে কাবীর-৭২২৩

মূলকথা

কুরআন স্বর দিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী লক্ষ্য রাখা জরুরি:

১. আরবী ভাষাভাষিদের প্রচলিত নিয়ম-কানুন লক্ষ্য রাখা

২. তাজবীদ শাস্ত্রের কায়দা কানুন অনুসরণ করা

৩. স্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে ভান না করা। বরং স্বাভাবিক স্বরে কোমল কণ্ঠে তেলাওয়াত করা

৪. প্রচলিত গান-বাদ্যের সাথে সাদৃশ্য না রাখা

তাফসীর পার্ট -৪

এ অধ্যায়ে রয়েছে:

- ✓ তাফসীর শাস্ত্রের পরিচিতি
- ✓ তাফসীর শাস্ত্রের প্রকারভেদ
- ✓ তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস
- ✓ ইসরাঈলি রেওয়ায়েত ও তার বিধান
- ✓ প্রসিদ্ধ কিছু তাফসীরের পরিচিতি
- ✓ মুফাসসির সাহাবা যাঁরা ছিলেন
- ✓ তাফসীরের প্রকৃত উৎসসমূহ
- ✓ যেসব উৎস থেকে তাফসীর গ্রহণ করা যাবে না
- ✓ তাফসীর করতে যেসব যোগ্যতা প্রয়োজন

তাফসীর শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

শাব্দিক অর্থ: এটি একটি মাসদার সূচক শব্দ। অর্থ হল, প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, প্রকাশিত হওয়া, ব্যাখ্যা করা, খোলাসা করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

অর্থ: তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।[১৪৫]

এখানে তাফসীর শব্দটি শাব্দিক অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

বলা হয়, أَسْفَرَ الصُّبْحُ إِذَا أَضَاءَ (প্রভাত আলোকিত করেছে)

এখান থেকেই ভ্রমণকে আরবীতে সফর বলা হয়, কারণ, ভ্রমণ করলে দুনিয়ার অবস্থা ভ্রমণকারীর সামনে স্পষ্ট হয়।

পারিভাষিক অর্থ: মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্নভাবে পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। এখানে নির্বাচিত কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল:

১. আল্লামা জারকাশী রহ.-এর বিখ্যাত কিতাব "আল-বুরহান" এ বলেন,

التَّفْسِيْرُ: عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابُ اللهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ، وحِكَمِهِ، وَاسْتِمْدَادُ ذٰلِكَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ، وَالنَّحْوِ، وَالتَّصْرِيْفِ وَعِلْمِ الْبَيَانِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَاتِ وَيَحْتَاجُ لِمَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوْخِ.

অর্থ: তাফসীর হল, এমন একটি ইলম যার মাধ্যমে বুঝা যায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কিতাবের মর্ম, নির্গত আহকাম, হিকমত ইত্যাদি এবং এক্ষেত্রে সহায়তা নেওয়া হয় নাহু, সরফ, অলংকার শাস্ত্র, উসূলে ফিকহ, ইলমুল কিরাআত ও নাসেখ, মানসূখ ইত্যাদি শাস্ত্রসমূহ থেকে।

---

১৪৫. ফুরকান-৩৩

২. শায়খ মুহাম্মদ আলী সালামা "মানহাজুল ফুরকান" এ উল্লেখ করেন,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ أَحْوَالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ؛ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتِهِ عَلَى مُرَادِ اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ.

অর্থ: এটি এমন ইলম যার মাধ্যমে মানব সাধ্য অনুযায়ী কুরআনের লফজ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য খোঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সমন্বয়:

যেহেতু তাফসীর শাস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ভাষ্য আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় তাই শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সমন্বয়ও স্পষ্ট।

তাফসীর শাস্ত্রের প্রকারসমূহ:

মুফাসসিরীনে কেরাম তাফসীর শাস্ত্রকে বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেণিবিভাগ করেছেন। নিম্নে তা তুলে ধরছি:

১। অর্থ বুঝার দিক থেকে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত–

তাফসীর শাস্ত্র চারভাগে বিভক্ত:

১. এমন অর্থ যা প্রথম শুনার মাধ্যমে সকলেই আয়াত দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি বুঝতে সক্ষম। চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যেমন: তাওহিদ, জান্নাত, জাহান্নাম অর্থবোধক আয়াতসমূহ।
২. কুরআনের এমন অর্থ যা একজন মুফাসসির বুঝেন আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন ও গ্রামারের মাধ্যমে। অর্থাৎ, এসব আয়াতের তাফসীর জানতে হলে আরবীভাষীদের দালালাত , ইশারা, বাস্তবতা ইত্যাদি বুঝতে হবে।
৩. কুরআনের এমন অর্থ যা শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমগণ বুঝেন। অর্থাৎ, তা বুঝেন আরবী ভাষার সূক্ষ্মতর উসূলের আলোকে নযর ও ইজতিহাদের মাধ্যমে।
৪. কুরআনের এমন অর্থ যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। তা হল, মুহকাম আয়াত সমূহ। যেমন, আলিফ-লাম-মীম।[১৪৬]

---

১৪৬. সূত্র: আল বুরহান-২/১৬৪, ইবনে কাসীর-১/৬

২। জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, তাফসীর শাস্ত্র দু'ভাগে বিভক্ত:

১. তাফসীর বিল-মাসূর।

২. তাফসীর বির-রায়।

তাফসীর বিল-মাসুরের পরিচয়:

নস বা অকাট্য প্রমাণাবলীর মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করাকে তাফসীর বিল মাসুর বলে। যেমন, কুরআনের তাফসীর করা হাদীসের মাধ্যমে বা হাদীসের তাফসীর করা কুরআনের মাধ্যমে বা সাহাবা, তাবেয়ীদের আসারের মাধ্যমে। এটাকে তাফসীর বির রিওয়ায়াহও বলে। এ প্রকার তাফসীরের কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছি:

১. কিতাবুত তাফসীর লি-আব্দির রাজ্জাক সানআনী
২. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম লি-ইবনে আবি হাতিম
৩. আদদুর মানসূর লিল-ইমাম সুয়ুতী
৪. তাফসীরুল কুরআনিল আজীম লি-ইবনে কাসির
৫. মাআলিমুত তানজিল লি-ইমাম বাগাবী

তাফসীর বির-রায়ের পরিচয়:

উসূলের আলোকে বিজ্ঞ আলেমগণ সহীহ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে তাফসীর করেন, তাকে তাফসীর বির-রায় বলে। এটাকে তাফসীর বির-রায় আল মাহমুদ বা তাফসীর বিদ্দীরায়াহও বলে। জমহুর উলামায়ে কেরাম এ ধরনের তাফসীরকে জায়েয বলেছেন।

শরয়ী উসূল ছাড়া মনগড়া তাফসীর করাকে তাফসীর বির রায় আল মাযমূম। এটা জায়েজ নেই। সম্পূর্ণ হারাম। এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কঠিন ধমকি বর্ণিত হয়েছে।

তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ বিষয়ক কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছি:

১. আত তাফসীরুল কাবীর লি-ফাখরুদ্দীন আর-রাজী
২. আল জামে লি-আহকামুল কুরআন লিল-ইমাম কুরতবী

৩. তাফসীরে জালালাইন লি-জালালুদ্দীন মাহাল্লী

৪. রুহুল মাআনী লি-মাহমুদ আলূসী

৫. আল-বাহরুল মুহিত লি-আবি হাইয়্যান আন্দালূসী

তাফসীর বির-রায় আল-মাযমূম বিষয়ক কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছি:

১. তাফসীরু আবী আলি আল জুব্যাঈ

২. তাফসীরু আবী বকর আল আছাম

৩. তাফসীরু আব্দুল জাব্বার আল মু'তাযিলী[১৪৭]

বি. দ্র. তাফসীরের এমন কিছু কিতাব রয়েছে, যেগুলোতে আসার, রায় একই সাথে উল্লেখ করেছে। যেমন, জামিউল বায়ান লি-আবি জাফর আততবারী। এখানে আল্লামা ত্ববারী রহ. আসার ও সহীহ রায় একই সাথে উল্লেখ করেছেন।

তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস:

আমরা এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে এখন অবধি তাফসীর শাস্ত্র কীভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে এবং প্রত্যেক যুগে তাফসীর শাস্ত্র রূপ কেমন ছিলো আমি তা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

এ শাস্ত্রের ইতিহাসকে আমি চার ভাগে বিভক্ত করছি:

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তাফসীর শাস্ত্র যেমন ছিল

২. সাহাবাদের সময়ে এ শাস্ত্র

৩. তাবেয়ীদের যুগে এ শাস্ত্র

৪. তাবেয়ীদের পরবর্তী সময়ে এ শাস্ত্র

১৪৭. সূত্র: আল ইসরাঈলীয়াত-১/৪৫

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তাফসীর শাস্ত্র যেমন ছিল:

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষাও ছিল আরবী। যে কওমের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাদের ভাষাও ছিল আরবী। তাই মক্কা ও মদীনার মানুষদের কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। আরবীয়রা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার এটি একটি বড় কারণ ছিল। কিন্তু ভাষা বুঝলেই তো আর কুরআনের সূক্ষ্মতর বিষয়গুলো অনুধাবন করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে তো শারে'-এর শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কেননা, কুরআনে রয়েছে খফি, মুজমাল, মুতাশাবিহের সমাহার। তাই এসব ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম "শারে" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরণাপন্ন হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ওহীর অপেক্ষা করতেন। ওহী আসলে সাহাবায়ে কেরামকে ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিতেন। কখনো আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নিজের যোগ্যতার মাধ্যমে বয়ান করে দিতেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হয় প্রথম মুফাসসির।

২. সাহাবাদের সময়ে এ শাস্ত্র:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর সাহাবাগণ তাফসীরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এভাবে একটি নতুন তাফসীর যুগের সূচনা হয়। খলীফা আবু বকরসহ অধিকাংশ সাহাবা তাফসীরের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত প্রদানে সংযত থাকতেন। বরং এক্ষেত্রে তাদের মাদ্দা ছিল চারটি। তা হল:

- কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের তাফসীর করা।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাফসীরসমূহ সংরক্ষণ করে এর আলোকে তাফসীর করা।
- বিভিন্ন আয়াত থেকে ইস্তিমবাত করত সহীহ বুঝশক্তির উপর নির্ভর করে আয়াতের তাফসীর করা।

➤ আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের থেকে শুনে তাফসীর করা।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা মুফাসসির হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন:

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস
২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ
৩. আলী ইবনে আবী তালিব
৪. উবায় ইবনে কাব
৫. আবু বকর সিদ্দীক
৬. ওমর ইবনুল খাত্তাব
৭. উসমান ইবনে আফ্ফান
৮. যায়েদ ইবনে ছাবেত
৯. আবু মুসা আসআরী
১০. আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর

প্রথম চারজন হলেন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাফসীরের জন্য নিজের জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মারজায়ে আওয়াল হয়ে গিয়েছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করেছেন,

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ.

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দ্বীনের বুঝ দান করুন ও তাফসীর শিক্ষা দিন।[১৪৮] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুআর বরকতেই হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হয়েছেন। তাকে হিবরু হাজিহিল উম্মাহও বলা হত।

১৪৮. মুসনাদে আহমদ, নং-২৪২২

এ প্রকার তাফসীরের মূল্যায়ন :

যদি সাহাবী তাফসীরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত করে তাহলে সেটা মারফু হাদীসের হুকুমে হবে। আর তা মানা আবশ্যক।

আর যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত না করে তবে তা ওহী নাযিল হওয়ার কোন সাবাবের সাথে সম্পৃক্ত হলে বা আকল বহির্ভূত কোন বিষয় হলে এ প্রকার তাফসীরও মারফু হাদীসের হুকুমে হবে। মানা আবশ্যক।

অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিসবত না থাকলে এবং তা ওহী নাযিল হওয়ার কোন সাবাবের সাথে সম্পৃক্তও না বা আকল স্বীকৃতি দেয় এমন কোন বিষয় হলে এ প্রকার তাফসীর মাওকুফের হুকুমে।

তাবেয়ীদের যুগে এ শাস্ত্রঃ

সাহাবাগণের পর তাবেয়ীগণ তাফসীর এর কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তারা সাহাবাদের থেকে তাফসীর নকল করতেন। সাথে সাথে নিজেরাও উসূলের আলোকে ইজতিহাদ করতেন। এই সময় কালেই তাফসীর শাস্ত্র ব্যাপক হয়ে যায়। কিন্তু তাফসীর তখনও সুবিন্যস্ত ও সাজানো ছিলো না। তাবেয়ীগণ বিক্ষিপ্তভাবে তাফসীর করতেন। মাসহাফের মত তাফসীর তখনো নির্দিষ্ট কোথাও সংরক্ষিত ছিলো না। তাবেয়ীগণের মধ্যে সব চাইতে ভালো তাফসীর জানতেন মক্কাবাসীরা। কেননা, তারা সরাসরি ইবনে আব্বাস থেকে তাফসীর শিখেছেন। আর মদিনাবাসীরা তাফসীর শিখতেন উবায় ইবনে কাব থেকে। অন্যদিকে কুফাবাসীরা তাফসীর শিখতেন ইবনে মাসউদ থেকে। এ তিনটি মাদরাসা তাবেয়ীগণের যুগে অধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

তাবেয়ীগণের তাফসীর করার ক্ষেত্রে মাদ্দা ছিল চারটি। আর তা হলঃ

- কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের তাফসীর করা।
- সহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মাধ্যমে তাফসীর করা।

- সাহাবাদের থেকে তাফসীর নকল করতেন
- বিভিন্ন আয়াত থেকে ইজতিহাদ করত সহীহ বুঝশক্তির উপড় নির্ভর করে আয়াতের তাফসীর করা।

এ প্রকার তাফসীরের মূল্যায়নঃ

তাফসীর শাস্ত্রে তাবেয়ীগণের মতামত গ্রহণ করা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ তাদের মতামত গ্রহণ করাকে আবশ্যক মনে করেন। অনেকেই এই মতকে গ্রহণ করতে রাজি নন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত,

مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَمَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا، وَمَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ."

অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিব এবং যা সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হবে তাও আমরা গ্রহণ করব। তবে তাবেয়ীগণ থেকে যা বর্ণিত হবে সেক্ষেত্রে তা আমাদের মতই। (মানা আবশ্যক নয়)।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-র কথা এটা প্রমাণ করে যে, তাদের ভাষ্য মানা সবক্ষেত্রে আবশ্যক নয় বরং সত্যতা যাচাই করতে হবে।

অবশ্য যদি কোন তাফসীরের ক্ষেত্রে সমস্ত তাবেয়ীগণ ইজমা হয়ে যায়, তাহলে তা মানা দলিলের আলোকেই আবশ্যক। কারণ, ইজমা হল, ইসলাম ধর্মে নির্ভরযোগ্য চার দলিলের একটি।

তাবেয়ীদের পরবর্তী সময়ে এ শাস্ত্রঃ

এই অধ্যায়ের ইতিহাস হিজরীর দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় অবধি তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাসকে শামিল করে। আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই সময়কার ইতিহাস পয়েন্ট আকারে তুলে ধরার প্রয়াস করব।

১. এযুগের প্রথম দিকেও এই শাস্ত্র নকলের (মৌখিক বর্ণনা) উপর নির্ভরশীল ছিল। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে আর তাবেয়ীগণ সাহাবাদের থেকে এবং তাবে তাবেয়ীগণও তাবেয়ীগণ থেকে তাফসীর রেওয়ায়েত ও নকল করতেন। তখনও মাসহাফের মত তাফসীর নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থে রচিত হয়নি।

২. **তাফসীর শাস্ত্র রচিত হওয়ার প্রথমধাপঃ** হিজরীর দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে হাদীস শাস্ত্রের রচনার কাজ শুরু হয়। তখন মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস শাস্ত্রের কিতাবের মধ্যেই তাফসীরের অধ্যায় কায়েম করে বিক্ষিপ্তভাবে তাফসীর শাস্ত্র সংরক্ষণের কাজ শুরু করে দেন। যেমনটি করেছেন ইয়াযিদ ইবন হারুন, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না ও ওয়াকি ইবনুল জার্‌রাহ। বলা যায় এটাই বিক্ষিপ্তভাবে তাফসীর শাস্ত্র রচিত হওয়ার প্রথম ধাপ।

৩. **তাফসীর শাস্ত্রের স্বতন্ত্র রচনাঃ** যখন রচনার কাজ ব্যাপক হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ফনের ইলম সংরক্ষিত হতে শুরু করল তখনই তাফসীর শাস্ত্রের রচনা শুরু যায়। যেমনটি করেছেন ইবনে মাজাহ, ইবনে জারির ত্ববারী ও ইবন মুনযির। এ যুগে তাফসীর রচিত হত সূত্র বর্ণনা করে। তাফসীরের সাথে তাফসীরকারীর নামও বলে দেওয়া হত। সর্বপ্রথম কে তাফসীর রচনা করেন এটা বলা মুশকিল। এ তথ্য সংরক্ষিত হয়নি। অনেক তাফসীরের কিতাব আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি। তবে ইবনে জারির ত্ববারীকে শায়খুল মুফাসসরীন বলা হয়। কারণ, তার তাফসীর গ্রন্থটি আমাদের পযন্ত পূর্ণভাবে পৌঁছেছে। অবশ্য ইবনে তাইমিয়া "মাজমুআতুল ফাতাওয়া" ও ইবনে খল্লিকান "ওফায়াতুল আয়ান" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সর্বপ্রথম তাফসীর বিষয়ে কলম ধরেন আব্দুল মালিক ইবনে জুরাইজ।

৪. এক পর্যায়ে তাফসীর শাস্ত্র রচনার কাজ ব্যাপক হয়ে যায় এবং সূত্র অনুল্লেখ রেখে তাফসীরের রচনার কাজ শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল রচনা যেন দীর্ঘ না হয়ে যায়। এ সুযোগে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত ব্যাপক হতে শুরু করে। এটি ছিল তাফসীর শাস্ত্রের

একটি স্পর্শকাতর সময়। কারণ, এ সময়েই ইসলামের শত্রুরা ধর্মকে কলুষিত করার জন্য মনগড়া তাফসীর বানাতে শুরু করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একদল সৈনিক তৈরি করে দিয়েছেন যারা সহীহ তাফসীরকে যয়ীফ তাফসীর থেকে আলাদা করে দিয়েছেন।

৫. একটা সময় পৃথিবীতে ইলমে কালাম ও ইলমে ফালসাফার আবির্ভাব ঘটে। ইলমুত তাফসীরেরও তখন নতুন ধারা শুরু হয়ে যায়। যুগের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে তাফসীর বির রায়য়ের আর্বিভাব হয়। এযুগে তাফসীর বির রায় আল মাহমুদ এর সাথে সাথে তাফসীর বির রায় আল মাযমুমেরও আবির্ভাব ঘটে। মুফাসসিরীনে কেরাম এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যও করে দিয়েছেন।[১৪৯]

তাফসীরের মূল উৎস ছয়টি:

১. কুরআন। অর্থাৎ, কুরআন দিয়ে কুরআনের তাফসীর করা। এটি সবচেয়ে সঠিক ও নির্ভুল তাফসীর। তবে এ তাফসীর শুধু অভিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য, সকলের জন্য নয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبَسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এ আয়াতের তাফসীর إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ এ আয়াতটি দিয়ে করেছেন।

২. সুন্নাহ। অর্থাৎ, সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের তাফসীর করা। সুন্নাহ দ্বারা কুরআন তাফসীর করা বিষয়ে কুরআনে এসেছে; সূরা নাহল: ৪৪ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ওইসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

৩. সাহাবায়ে কেরামদের মতামত। অর্থাৎ, কোন আয়াতের তাফসীরের ক্ষেত্রে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা। তাদের মতামত গ্রহণ করা বিষয়ে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে-

➢ তাঁরা কুরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছেন এবং অবস্থার সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলেন

---

১৪৯. লামহাত ফী উলূমিল কুরআন, ফসল: তারিখুত তাফসির

- তাঁদের ও কুরআনের ভাষা একই
- তাঁরা আসবাবুন নুযুল সর্ম্পকে অবগত
- তাঁদের উদ্দেশ্য স্বার্থহীন
- তাঁদের বোধশক্তি খুব প্রখর

৪. তাবেয়ীনদের মতামত। অর্থাৎ, তাফসীরের ক্ষেত্রে তাবেয়ীদের মতামত গ্রহণ করা। কারণ, তাঁরা কুরআন সাহাবায়ে কেরাম থেকে শিখেছেন।

৫. আরবী ভাষা। অর্থাৎ, কুরআনের কোন আয়াত বুঝতে আরবী ভাষার সহযোগিতা নেওয়া।

৬. ইজতেহাদ। অর্থাৎ, কুরআন বুঝতে ইজতেহাদের সাহায্য নেওয়া, যেমনটা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. নিয়েছিলেন।[১৫০]

যেসব উৎস থেকে তাফসীর গ্রহণ করা যাবে না:

আমরা জানলাম যেসব উৎস থেকে তাফসীর গ্রহণ করব। এবার আমরা জানব যেসব উৎস থেকে তাফসীর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। যাতে আমরা সর্তক থাকতে পারি।

১. ইসরাঈলি রেওয়ায়েত:

ইসরাঈলি রেওয়ায়েতের হাকীকত ও বিধান:

কুরআনে বিগত নবীদের ও বিগত সম্প্রদায়ের বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, যাতে উম্মাতে মুহাম্মাদী এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ আরো বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হন। আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদি, নাসারাদের মধ্যে যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করতেন, তাদেরকে সাহাবায়ে কেরাম কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ তাওরাত, যাবুরে বিস্তারিত কী বর্ণিত হয়েছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।

নবমুসলিম আহলে কিতাবরাও সাহাবায়ে কেরামকে বিস্তারিত অবগত করতেন। এসব রেওয়াতকেই ইসরাঈলি রেওয়াতের বলা হয়।

---

১৫০. তাফসীরে জালালাইনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা নং: ৭-৮

ইসরাঈলি রেওয়াতের বিধানঃ

ইসরাঈলি রেওয়াতের তিনটি ভাগ রয়েছেঃ

- ইসরাঈলি রেওয়াতের সত্যতা যদি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে তা আমাদের জন্য প্রমাণযোগ্য এবং আমলযোগ্য। এসব রেওয়ায়েত দ্বারা দলিলও পেশ করা যাবে।

যেমন, তাওরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী করা আছে। মূসা আ. খিযির আ.-এর ঘটনা ইত্যাদি কুরআন হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। সুতরাং এসব আমাদের জন্য প্রমাণযোগ্য। আর এসব রেওয়াতের ব্যাপারেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ"

- ইসরাঈলি রেওয়াতের সত্যতা যদি কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হয় বরং তা কুরআন হাদীসের মুখালিফ হয়, তাহলে তা আমাদের জন্য প্রমাণযোগ্য নয় এবং আমলযোগ্যও নয়। এসব রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করা হারাম। হুকুম বয়ান করার উদ্দেশ্যে এসব রেওয়ায়েত বর্ণনা করা যাবে।

যেমন ইসরাঈলী রেওয়ায়েত প্রমাণ করে, পূর্ববর্তী নবীগণ পাপের উর্ধ্বে ছিলেন না। বরং তারাও পাপ করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) এসব রেওয়ায়েত দ্বারা দলিল পেশ করা হারাম। এসব গ্রহণ করা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ধমকি বর্ণিত হয়েছে।

- ইসরাঈলি রেওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে নীরব। কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আবার কুরআন হাদীসের মুখালিফও নয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হল নীরবতা অবলম্বন করা। সত্যও বলা যাবে না আবার মিথ্যাও বলা যাবে না।

যেমন, নূহ আ.-এর কিস্তির পরিমাণ কত ছিল। খিযির আ. যে শিশুকে হত্যা করেছিলেন তার নাম কী ইত্যাদি। আর এসব রেওয়াতের ব্যাপারেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ.

২. **সুফিদের তাফসীর:** কতক সুফিদের থেকে এমন কিছু তাফসীর বর্ণিত আছে, যা আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে বা অন্য কোন শরয়ী দলিলের সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন, কুরআনে বর্ণিত আছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

সুফিরা এ আয়াতের তাফসীর করেছেন,

وَ قَاتِلُوْا النَّفْسَ فَإِنَّهَا تَلِيْ الْإِنْسَانَ.

অর্থ: তোমরা নফসের সাথে জিহাদ করো। কারণ নফস হলো মানুষের সবচে' নিকটবর্তী।

অনেকেই এটাকে কুরআনের তাফসীর ভেবে নিয়েছে। অথচ সুফিয়ানে কেরামের উদ্দেশ্য আয়াতের তাফসীর বয়ান করা ছিল না। যেটা যাহেরী আয়াতের বিপরীত। বরং তারা এটা পারিপার্শ্বিক হিসেবে বলেছেন।

সুফিদের তাফসীরের মূল্যায়ন:

সুফিদের তাফসীরের ব্যাপারে আমাদের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি রাখা আবশ্যক:

- সুফিদের তাফসীরকে কুরআনের মূল তাফসীর ভাবা যাবে না। বরং মূল তাফসীর তা যা তাফসীরের মূল মা'কাযে বর্ণিত আছে। সুফিদের তাফসীর কেবল তাদের ইজতিহাদ ও ইস্তিমবাত।

- সুফিদের ঐ সমস্ত তাফসীরই গ্রহণযোগ্য যেসব তাফসীর কুরআনের যাহেরী আয়াত বা উসূলে মুসাল্লামার সাংঘর্ষিক নয়। বুঝা গেল সুফিদের তাফসীরের উপর নির্ভর করা যাবে না।
- সুফিদের ঐ সমস্ত ইজতিহাদ ও ইস্তিমবাত গ্রহণযোগ্য যার ফলে কুরআনের অর্থ বা শব্দের বিকৃতি না ঘটে।

সুফিদের তাফসীর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এসব বিষয় সামনে রাখলে কোন পদস্খলনের শিকার হবো না। ইনশাআল্লাহ।

৩. **তাফসীর বির-রায়ঃ** এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাফসীর বির-রায় আল-মাযমূম। অথাৎ, যে তাফসীরের ভিত্তি সহীহ উসূল, ইজতিহাদের উপর নয়।

জামে তিরমিযীতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ قَالَ فِيْ الْقُرْاٰنِ بِرَأْيِه فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর করবে তার রায় দ্বারা অতঃপর তা সঠিক হয়ে গেল তাহলেও সে ভুল করল। (কারণ, সে তাফসীর করার ক্ষেত্রে সহীহ পদ্ধতি অবলম্বন করেনি।)[১৫১]

যেসব তাফসীর বির-রায় অগ্রহণযোগ্যঃ

নিম্নোক্ত সুরতসমূহে তাফসীর বির-রায় গ্রহণ করা যাবে নাঃ

১) যে ব্যক্তি তাফসীর করার যোগ্যতা রাখে না। তাফসীর বিষয়ে অযোগ্য; তাহলে তার তাফসীর বির-রায় গ্রহণ করা যাবে না।

২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত তাফসীর সাংঘর্ষিক হলে।

৩) আয়াতে মুতাশাবিহের তাফসীর দৃঢ়তার সাথে করলে

৪) এমন তাফসীর, যার ফলে ইজমার সাংঘর্ষিক হয়

৫) আরবী ভাষা, কানুন, আদব ও আকলে সালিম বাধাগ্রস্ত হয় এমন তাফসীর

---

১৫১. হাদীস নং-২৯৫২, আবূ দাউদ-৩৬৫২

তাফসীর করার যোগ্যতাসমূহ:

একজন তাফসীরকারকের জন্য বেশকিছু যোগ্যতা থাকা আবশ্যক:

১. আরবী ভাষার আভিধানিক জ্ঞান
২. আরবী ব্যাকরণ সর্ম্পকিত জ্ঞান
৩. সরফ তথা বাক্য রূপান্তরের জ্ঞান
৪. শব্দের অর্থগত জ্ঞান
৫. বাক্যালংকার শাস্ত্রের জ্ঞান
৬. ভাষার সৌন্দর্য জ্ঞান
৭. শব্দনির্গত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান
৮. উচ্চারণরীতি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান
৯. ধর্মের মৌলিক জ্ঞান
১০. ফিকাহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান
১১. ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান
১২. ানে নুযূল, প্রেক্ষাপট উক্ত বিষয় সম্পর্কে যদি কারও জ্ঞান না থাকে তাহলে সে কখনোই মুফাসসির হিসেবে গণ্য হবে না।

প্রসিদ্ধ কিছু তাফসীরগ্রন্থের পরিচিতি:

১. **তাফসীরে ইবনে আব্বাস:** এটা ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে রচিত কোন কিতাবের নাম নয়। কারণ ইবন আব্বাস রাযি. এ নামে কোন কিতাব লিখে যান নি। বরং তাফসীরে ইবনে আব্বাস দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্য কোন লেখক তার পক্ষ থেকে বর্ণিত তাফসীরসমূহ নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থে সংরক্ষণ করা।

অনেকেই ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তাফসীরসূমহ জমা করে তাফসীরে ইবনে আব্বাস নাম দিয়েছেন। আমি এখানে এমন কয়েকটি প্রসিদ্ধ নুসখার কথা উল্লেখ করছি:

○ তানবীরুল মাকাস মিন তাফসীরি ইবনি আব্বাস। এখানে সংকলক ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তাফসীরসমূহ জমা করেছেন।

সংকলক হলেন "কামুসুল মুহিত" এর লিখক আল্লামা ফাইরুজাবাদী রহ.। এ নুসখাটি তাফসীরে ইবনে আব্বাস নামেই পরিচিত। নুসখাটি সুদ্দী ছাগীর, মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব আল কালবী থেকে। মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব আল কালবী, আবু ছালেহ আস-সাম্মান থেকে। আবু ছালেহ আস সাম্মান হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই সূত্রে বর্ণিত।

নুসখাটির নিসবতের সত্যতা নিয়ে উলামায়ে কেরাম যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেছেন।

○ সহিফাতু আলী ইবনে আবী তালেব। এখানেও ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তাফসীরসমূহ জমা করা হয়েছে। আল্লামা সূয়ূতী রহ. আল-ইতকানে ইমাম আহমদ সূত্রে বয়ান করেন, ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তাফসীরসমূহের মধ্যে সবচে সহীহ নুসখা হল সহিফাতু আলী ইবনে আবী তালেব। কিন্তু কালের আবর্তনে নুসখাটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোন মাকতাবায়-ই এর নুসখা পাওয়া যায় না।

বর্তমান সময়ে রাশেদ ইবনে আব্দুল মুনয়িম তাহকীক তালীক করে এর একটি নুসখা বের করেছেন।

২. **তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ** কিতাবটি লিখেছেন হাফেজ ইমাদুদ্দিন আবু ফিদা ইসমাঈল ইবনে খতিব আবু হাফছ ওমর ইবনে কাসীর। (মৃত্যুঃ ৭৪৭ হি.) তাফসীরটি দারে তায়্যিবাহ থেকে কালো লাল প্রচ্ছদে মোট আট খণ্ডে ছেপেছে। দারে ইবনে হাযেম ও দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকেও ছেপেছে।

এটি তাফসীর বিল-মাছূর জাতীয় একটি কিতাব। এখানে লেখক কুরআনের তাফসীর করেছেন কুরআনের বা হাদীসের, সাহাবায়ের কেরামের কওলের মাধ্যমে। অনেকেই এটাকে তাফসীরে ইবনে জারির তাবারীর সংক্ষেপ মনে করেন।

৩. **তাফসীরে কাবীরঃ** গ্রন্থটির মূল নাম হল 'মাফাতিহুল গায়ব'। কিন্তু তাফসীরে কাবীর নামেই প্রসিদ্ধ। লিখেছেন, ফখরুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে জিয়াউদ্দিন ওমর আররাজী। (মৃঃ ৬০৬ হি.) কিতাবটি দারুল

ফিকর থেকে মোট ৩২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি তাফসীর বিদ্দীরায়া-এর একটি বেনযির কিতাব। ফিকহ ও আকল সমৃদ্ধ একটি তাফসীর। ফিকহি মাসায়েল দলিলসহ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন এবং কুরআনের জটিল ও কঠিন আয়াতগুলো সুষ্ঠু ও সুস্পষ্ট সমাধান দিয়েছেন।

আল্লামা তাকী উসমানী উলূমুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হল আমি যখনই কুরআনের জটিল কোন আয়াতে থেমে যাই এবং বুঝে না আসে তখনই তাফসীরে কাবীর সংশ্লিষ্ট আয়াতের জটিলতা খুলে দেয়। এটাই তাফসীরে কাবীরের কামাল।

৪. **আহকামুল কুরআন**। লিখেছেন, আল্লামা আহমদ ইবনে আলী আররাজী আল জাস্‌সাস। দারু ইহয়ায়িল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ থেকে মোট ৫ খণ্ডে তাফসীরটি প্রকাশিত হয়েছে। এনামে আল্লামা ইবনে আরাবি, থানাবী ও আলী সাবুনী তাফসীরগ্রন্থ লিখেছেন।

এটি আহকামভিত্তিক একটি তাফসীর। আহকাম সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ এখানে দলিলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারি একই তরযের একটি তাফসীর।

৫. **রুহুল মাআনী**। পুরো নাম হল, রুহুল মাআনী ফী তাফসীরিল কুরআনিল আযিম ওয়াস-সাবয়ি মাসানী। এটি বাগদাদের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মাহমুদ আলূসী লিখেছেন। (মৃঃ ১২৭০ হি.) এটি ৩১ খণ্ডে ইদারাতুত ত্বাবাআ আল-ইসলামিয়া থেকে ছেপেছে।

শেষ যুগের তাফসীর তাই লেখক এখানে পূর্ববর্তী সকল তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। এই তাফসীরে সকল ফন তথা নাহু, সরফ, আদব, বালাগাত ও ফিকহ ইত্যাদি শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসের রেওয়ায়েত নিয়েও ছিলেন যথেষ্ট সর্তক।

এ হিসেবে এ তাফসীরকে সকল তাফসীরের খুলাসা বলা যায়।

পার্ট-৫

এ অধ্যায়ে রয়েছে:

- ✓ আসবাবুন নুযুলের পরিচয়
- ✓ আসবাবুন নুযুলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ✓ এ সম্পর্কে যারা কলম ধরেছেন

শানে নুযূলঃ

শানে নুযূল উলূমে ইসলামিয়্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। কুরআনের সহীহ জ্ঞান অর্জনের জন্য শানে নুযূল সম্পর্কে ধারণা রাখার বিকল্প নেই।

শানে নুযূলের পরিচয়ঃ

একে আরবীতে বলে "আসবাবুন নুযূল"। অর্থ কুরআন নাযিল হওয়ার কারণসমূহ।

হাজি খলিফা বলেন,

وَهُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ سَبَبِ نُزُوْلِ سُوْرَةٍ أَوْ آيَةٍ وَ وَقْتِهَا وَمَكَانِهَا وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

অর্থঃ শানে নুযূল এমন একটি ইলম যার মধ্যে কোন সূরা বা আয়াতের নাযিল হওয়ার কারণ বা সময় ও স্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।[১৫২]

আল্লামা কুশাইরী রহ. বলেন,

سَبَبُ النُّزُوْلِ طَرِيْقٌ قَوِيٌّ فِيْ فَهْمِ مَعَانِيْ الْكِتَابِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ أَمْرٌ تَحْصُلُ لِلصَّحَابَةِ بِقَرَائِنٍ تَحْتَفُّ بِالْقَضَايَا.

অর্থঃ শানে নুযূল পবিত্র গ্রন্থ আলকুরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। আর ঘটনা সংশ্লিষ্ট দলিলের মাধ্যমে তা সাহাবায়ে কেরামের কাছে অর্জিত হয়।[১৫৩]

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِه وَيُبَيِّنُ آيَاتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

---

১৫২. কাশফুয যনূন, মাদ্দা ইলমু আসবাবিন নুযূল
১৫৩. আল বুরহান-২৮

অর্থ: আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলিম ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।[১৫৪]

এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তা হল, হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ গানাভী রাযি.-এর সাথে জাহিলী যুগ থেকেই এক মহিলার সাথে সম্পর্ক ছিল।

হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ গানাভী রাযি. ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় হিজরত করেন। অতঃপর বিশেষ প্রয়োজনে তিনি মক্কায় যান। তখন ঐ মহিলা তাঁকে পাপকাজের প্রতি আহবান করে। হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ গানাভী রাযি. স্পষ্ট ভাষায় তা প্রত্যাখ্যান করে বলে দিলেন, "ইসলাম আমার আর তোমার মাঝে এ পাপ কাজ করা থেকে প্রতিবন্ধক। তুমি চাইলে আমি আল্লাহর রাসূলের অনুমতি সাপেক্ষ তোমাকে বিয়ে করতে পারি"।

হযরত মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ গানাভী রাযি. মদীনায় ফিরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পছন্দের কথা জানালেন এবং বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তার এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ২২১ নং আয়াত নাযিল করেন।

ডা. গানেম কাদ্দুরী হামদ বলেন, কুরআনের আয়াত দু'ভাগে বিভক্ত।

---

১৫৪. সূরা বাকারা-২২১

১. قِسْمٌ نَزَلَ اِبْتِدَاءً (যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে কোন প্রেক্ষাপট ছাড়া) এসব আয়াত সাধারণত আকায়েদ, জান্নাত, জাহান্নাম ও কিয়ামত বিষয়ে হয়ে থাকে।

২. قِسْمٌ نَزَلَ عَقِبَ حَادِثَةٍ أَوْ سُوَالٍ (যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে কোন ঘটনা বা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে) এসব আয়াত সাধারণত শারীয়াহ, আদাব, আহকাম ও মাসায়েল বিষয়ে হয়ে থাকে।[১৫৫]

শানে নুযূলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

তাফসীর শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সবার উপর ফরজ নয়। বরং তা ফরজে কেফায়া। কতক লোকের এ শাস্ত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে অবশিষ্ট সবার ফরজিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে।

শানে নুযূলও তাফসীর শাস্ত্রে একটি অনবদ্য অংশ। সুতরাং আমরা বলতে পারি শানে নুযূল সম্পর্কে জ্ঞান রাখাও সবার উপর ফরজ নয়। বরং তা ফরজে কেফায়া। কতক লোকের সংরক্ষণের মাধ্যমে অবশিষ্ট সবার ফরজিয়্যাত আদায় হয়ে যাবে।

আল্লামা ওয়াহেদী রহ. বলেন, শানে নুযূল জানা না থাকলে কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব না।

আল্লামা ইবনে দাকীক আল-ঈদ রহ. বলেন, কুরআন সহীহ ভাবে বুঝার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হল শানে নুযূল জানা।

আল্লামা ইবনে তায়মিয়া রহ. বলেন, শানে নুযূল জানা থাকলে কুরআনের তাফসীর বুঝতে সহায়ক হয়। কারণ শানে নুযূল জানার মাধ্যমে মুসাব্বাব তথা সংশ্লিষ্ট বিধানের জ্ঞান অর্জন হয়।[১৫৬]

আল্লামা তাকী উসমানী হাফি. বলেন, "অনেকে মনে করেন কুরআন স্বয়ং স্পষ্ট। সুতরাং শানে নুযূল জানা নিষ্প্রয়োজন। কথাটি একদম ভিত্তিহীন। কারণ, তাফসীর শাস্ত্রের জন্য শানে নুযূলের জ্ঞান রাখা আবশ্যকীয় শর্ত"।

---

১৫৫. মুহাযারাত-৩৯

১৫৬. মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন-৭৬

ডা. গানেম কাদ্দুরী হামদ বলেন, সংশ্লিষ্ট আয়াত বুঝার ক্ষেত্রে শানে নুযূলের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তো শানে নুযূল জানা না থাকলে আয়াতের অর্থই উল্টে যায়। সুতরাং বলা যায় শানে নুযূল কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগী ও আহকাম বের করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং ঈমান আনে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন।[১৫৭]

এ আয়াতটি তেলাওয়াতকারী মনে করবে পূর্বোক্ত গুণে যারাই গুণান্বিত তাদের জন্য সবকিছু খাওয়া যায়েজ। তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই খাওয়ার অবকাশ আছে। যদিও তা হারাম কিছু হয় (মা'জাল্লাহ) কিন্তু এ আয়াতের শানে নুযূল জানা থাকলে এ ধরনের পদস্খলন ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তাআলা মদ পান করা হারাম করে দিলেন তখন কতক সাহাবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সাথীদের যারা মদ পান করত এবং মদ হারাম হওয়ার পূর্বেই মারা যান তাদের কি বিধান? (আল্লাহ কি তাদেরকে এ জন্য শাস্তি দিবেন?)

---

১৫৭. সূরা মায়েদা-৯৩

এ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ জাল্লা শানুহু সূরা মায়েদার পূর্বোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

এ শানে নুযূলটি জানা থাকলে পাঠকের পদস্খলন ঘটবে না। এটাই হল শানে নুযূল জানার প্রয়োজনীয়তা।[১৫৮]

শানে নুযূল জানার ফায়দা:

শানে নুযূল জানার অনেক ফায়দা রয়েছে। আমি এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরছি,

১. আহকামের হিকমত জানা যায়। আল্লাহ তাআলা যে কারণে সংশ্লিষ্ট আহকামটি নাযিল করেছেন তা জানা যায়।

২. মাকাসিদে শারইয়্যাহ জানা যায়। তথা সংশ্লিষ্ট আহকামটিতে শরীয়তের মেজাজ কি তা জানা যায়। যার ফলে ইজতিহাদ করতে সহজ হয়।

৩. শানে নুযূল কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগী ও আহকাম বের করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের অস্পষ্ট অর্থ সুস্পষ্ট হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তাআলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।[১৫৯]

বাহ্যিক আয়াত বুঝায় সায়ী ফরজ বিধান নয়। কেননা "লা জুনাহা" দ্বারা মুবাহ বুঝানো হয়। ফরজ নয়। কতক উলামায়ে কেরাম বাহ্যিক

১৫৮. মুহাযারাত ফি উলূমিল কুরআন-৩৯
১৫৯. সূরা বাকারা-১৫৮

আয়াত ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আম্মাজান আয়েশা রাযি. আয়াতের শানে নুযূল বয়ান করার মাধ্যমে এ মতকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন।

শানে নুযূল হল, সাহাবায়ে কেরাম সাফা ও মারওয়ার মধ্যে প্রদক্ষিণ করা পাপকাজ মনে করতেন। কেননা, জাহিলী যুগে সবাই এ দুটি প্রদক্ষিণ করত এবং সাফায় থাকা আসাফ নামক মূর্তি ও মারওয়ায় থাকা নায়েলা নামক মূর্তিকে স্পর্শ করত।

তাদের এ ভুল ভাঙ্গাতেই আল্লাহ তাআলা আয়াতটি নাযিল করেন। এখানে সায়ী করার বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল তাদের সৃষ্ট ভুল ভাঙ্গানো।

আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا" فَوَاللهِ مَاعَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَّا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

قالت: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِيْ إِنَّ هٰذِه لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن لَّا يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِيْ الْأَنْصَارِ كَانُوْا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةِ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مِنْ أَهْلٍ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوْا سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ ﷺ وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا.

অর্থ: প্রখ্যাত তাবেয়ী যুহরী থেকে বর্ণিত, উরওয়া বলেন, আমি 'আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? "সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কাজেই যে কেউ কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ সম্পন্ন করে,

এ দু'য়ের মাঝে যাতায়াত করলে তার কোন দোষ নেই"।[১৬০] (আমার ধারণা হল-) সাফা-মারওয়ার মাঝে কেউ সায়ী না করলে তার কোন দোষ নেই। তখন আয়েশা রাযি. বললেন, ওহে বোনপো! তুমি যা বললে, তা ঠিক নয়। কেননা, যা তুমি তাফসীর করলে, যদি আয়াতের মর্ম তাই হতো, তাহলে আয়াতের শব্দ বিন্যাস এভাবে হতো "দুটোর মাঝে সায়ী না করায় কোন দোষ নেই।" কিন্তু আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশাল্লাহ নামক স্থানে স্থাপিত মানাত নামের মূর্তির পূজা করত, তার নামেই তারা ইহরাম বাঁধত। সে মূর্তির নামে যারা ইহরাম বাঁধত তারা সাফা-মারওয়া সা'ঈ করাকে দোষণীয় মনে করত। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পূর্বে আমরা সাফা ও মারওয়া সায়ী করাকে দোষণীয় মনে করতাম (এখন কি করবো?) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তাআলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আয়েশা রাযি. বলেন, (সাফা ও মারওয়ার মাঝে) উভয় পাহাড়ের মাঝে সায়ী করা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধান দিয়েছেন। কাজেই কারও পক্ষে এ দু'য়ের সায়ী পরিত্যাগ করা ঠিক নয়।

৪. কুরআনে এমন কিছু আয়াত আছে, যেখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে কোন ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি শানে নুযূল জানা না থাকে তাহলে আয়াতের মতলব বুঝে আসে না। তাই সেক্ষেত্রে শানে নুযূল জানা খুবই প্রয়োজনীয়।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰـكِنَّ اللهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করনি, যখন

১৬০. আল-বাকারা-১৫৮

তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী; পরিজ্ঞাত।[১৬১]

এ আয়াত দ্বারা বদর যুদ্ধের একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১৬২]

শানে নুযূল জানা থাকলে কুরআন হিফজ করতে সহজলভ্য হয়। কেননা, কোন কিছু ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হলে তা মেধা ও মননে সহজেই স্থির হয়ে যায়।

শানে নুযূলের বিধান ব্যাপক:

কুআনুল কারীমে অধিকাংশ আহকামের আয়াত বিশেষ কোন ঘটনা বা ভুল ধারণাকে দূর করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

ইয়াহুদীদের মধ্যে কারও স্ত্রীর হায়েজ হলে তারা তাকে ঘর থেকে বের করে দিত। তাদের সাথে উঠা বসা, আহার গ্রহণ ও মেলামেশা ইত্যাদি বন্ধ করে দিত।

পৃথিবীতে ইসলাম আসার পর সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘটনাটি হযরত আনাস রাযি. থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত,

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُوْدَ كَانُوْا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ- النَّبِيَّ -ﷺ- فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا: مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ

---

১৬১. সূরা আনফাল-১৭

১৬২. আল বুরহান-২৮, আল ইতকান-৭১, মাবাহিস-৭৪

كَذَا وَكَذَا. فَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ فِيْ آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

অর্থ: ইয়াহুদীগণ তাদের মহিলাদের হায়েজ হলে তার সাথে এক সঙ্গে খাবার খেত না এবং এক ঘরে বাস করত না। সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন,

"তারা তোমার কাছে হায়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও যে, তা হলো নাপাক। সুতরাং হায়েজ অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাক।[১৬৩]

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইয়াহুদীদের কাছে পৌঁছলে তারা বলল,

"এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায়।"

অতঃপর উসায়দ ইবনে হুযায়র রাযি. ও আব্বাস ইবনে বিশর রাযি. এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদীরা এমন এমন বলছে। আমরা কি তাদের সাথে (হায়েজ অবস্থায়) সহবাস করব না?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। এতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন।

তারা উভয়ে বেরিয়ে গেল। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দুধ হাদিয়া এলো। তিনি তাদেরকে ডেকে আনার জন্যে লোক পাঠালেন। তারা এলে তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন। তখন তারা বুঝল যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি।[১৬৪]

---

১৬৩. সূরা আল-বাকারাহ
১৬৪. সহীহ মুসলিম-৫৮১

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

অর্থ: আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েজ (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।[১৬৫]

এ আয়াতটি পূর্বোক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। যা সাহাবায়ে কেরামের সৃষ্ট ভুল ধারণা দূর করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।

এখানে তো শানে নুযূল আম বা ব্যাপক। যা সকল সাহাবায়ে কেরামকে শামিল করে। এ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই। এ ধরনের আহকাম সবার মতেই আম বা ব্যাপক।

তবে যদি শানে নুযূল খাস বা নির্দিষ্ট ব্যক্তি কেন্দ্রিক হয় তাহলে তার হুকুম খাস হবে নাকি এই হুকুমের মধ্যে সবাই প্রযোজ্য। এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

১. জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে শানে নুযূল খাস হলেও হুকুম আম। এ হুকুম সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। যার মধ্যে শানে নুযূলে বর্ণিত গুণাবলী পাওয়া যাবে তার জন্যই সেই হুকুম কার্যকর হবে।

---

১৬৫. সূরা বাকারা, ২২২

যেমন লিআনের আয়াত নাযিল হয়েছে হেলাল ইবনে উমাইয়ার ব্যাপারে কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় লিআনের বর্ণিত হুকুম সবার জন্য প্রযোজ্য।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ، فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِيْ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ {وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتّٰى يَبْلُغَ {إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِيْنَ}

فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى يظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ ابْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ.

অর্থ: ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হিলাল ইবনে উমাইয়াহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শারীক ইবনে সাহমার সঙ্গে তার স্ত্রীর ব্যভিচারের অভিযোগ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সাক্ষী (হাযির কর) নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে। হিলাল বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাদের কেউ তার স্ত্রীর উপর অন্য কাউকে দেখে তখন সে কি সাক্ষী তালাশ করতে

যাবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, সাক্ষী, নতুবা শাস্তি তোমার পিঠে।

হিলাল বললেন, শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এমন বিধান অবতীর্ণ করবেন, যা আমার পিঠকে শাস্তি থেকে মুক্ত করে দিবে। তারপর জিবরীল আ. এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হল, "যারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে" থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন, "যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে" পর্যন্ত। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরলেন এবং তার স্ত্রীকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। হিলাল এসে সাক্ষ্য দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বলছিলেন, আল্লাহ তাআলা তো জানেন যে, তোমাদের দু'জনের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী। তবে কি তোমাদের মধ্যে কেউ তওবা করবে? স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল।

সে যখন পঞ্চমবারের কাছে পৌঁছল, তখন লোকেরা তাকে বাধা দিল এবং বলল, নিশ্চয়ই এটি তোমার উপর অবশ্যম্ভাবী। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এ কথা শুনে সে দ্বিধাগ্রস্ত হল এবং ইতস্তত করতে লাগল। এমনকি আমরা মনে করতে লাগলাম যে, সে নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তন করবে। পরে সে বলে উঠল, আমি চিরকালের জন্য আমার বংশকে কলুষিত করব না। সে তার সাক্ষ্য পূর্ণ করল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর প্রতি দৃষ্টি রেখ, যদি সে কাল ডাগর চক্ষু, বড় পাছা ও মোটা নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে ও সন্তান শারীক ইবনে সাহমার। পরে সে ঐরূপ সন্তান জন্ম দিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি এ বিষয়ে আল্লাহ্ কিতাব কার্যকর না হত, তা হলে অবশ্যই আমার ও তার মধ্যে কী ব্যাপার যে ঘটত।[১৬৬]

---

১৬৬. সহীহ বুখারী-৪৭৪৭

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যারা তাদের স্ত্রীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দিবে তাদের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, শানে নুযূল খাস (লিআনের ক্ষেত্রে যেমন বিধান হেলাল রাযি. কে কেন্দ্র করে নাযিল করা হয়েছে) হলেও হুকুম সবার জন্য ব্যাপক।

আল্লামা সুয়ূতি রহ.সহ প্রখ্যাত সকল মুফাসসিরীনে কেরাম এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মাবাহিস-এর লেখক বলেন, এটা সর্বসম্মত মত। এই মতের উপরই আমল করেছেন সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনে কেরাম।[১৬৭]

কতক মুফাসিসর থেকে বর্ণিত, শানে নুযূলের হুকুম খাস। এটা সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। অন্য কোথাও এ বিধান প্রয়োগ করতে হলে সেক্ষেত্রে নতুন দলিলের প্রয়োজন। নতুন স্বতন্ত্র দলিল ছাড়া এ বিধান অন্য কোথাও প্রযোজ্য হবে না।

এটি দুর্লভ মত। জমহুর উলামায়ে কেরাম এ মতটি গ্রহণ করেননি।

শানে নুযূলের জানার উৎস:

যেহেতু শানে নুযূল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণিত আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত তাই সুস্পষ্ট যে শানে নুযূলও বর্ণিত হতে হবে। এখানে চিন্তা-ভাবনা করে বলার কিছু নেই। বরং শানে নুযূলও আমাদের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হয়ে আসতে হবে।

আল্লামা ওয়াহেদী উল্লেখ করেন,

"لَا يَحِلُّ الْقَوْلُ فِيْ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ إِلَّا بِالرِّوَايَةِ وَالسَّمَاعِ مِمَّنْ شَاهَدُوْا التَّنْزِيْلَ وَ وَقَفُوْا عَلَى الْأَسْبَابِ وَبَحَثُوْا عَنْ عِلْمِهَا وَجَدُوْا فِيْ الطَّلَبِ."

১৬৭. মাবাহিস-৮০

অর্থ: সহীহ রেওয়ায়েত নির্ভর ব্যতীত কারও জন্য শানে নুযূল ব্যক্ত করা জায়েজ হবে না এবং এমন সব রাবীদের থেকে বর্ণিত হতে হবে যারা কুরআন নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখেছে এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে।[১৬৮]

জমহুর উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে এক মত যে, শানে নুযূল বর্ণিত হতে হবে বিশ্বস্থ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাহাবা বা তাবেয়ীদের থেকে। তাঁরাই হলেন শানে নুযূল জানার মূল উৎস।

ইবনে সিরীন রহ. বলেন–

"سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: اِتَّقِ اللهَ وَقُلْ سِدَادًا، ذَهَبَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ"

অর্থ: আমি উবায়দাকে একটি আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক বল। যারা (সাহাবায়ে কেরাম) জানে আল্লাহ কোন ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল করেছেন তারা বিগত হয়েছেন।[১৬৯]

বুঝা গেল কুরআনের শানে নুযূল বর্ণিত হবে সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।[১৭০]

---

১৬৮. আসবাবুন নুযূল লিল ওয়াহেদী-৫

১৬৯. ইতকান-৭৫

১৭০. সূরা নিসা-৬৫

হযরত যুবাইর বলেন, আমি মনে করি পূর্বোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে হাররার নালার পানির ব্যাপারে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পরা একজন মুহাজির ও আনসারীর ব্যাপারে।

আইম্মায়ে সিত্তা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاء إِلَى جَارِكَ." فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ "اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ". فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذٰلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.

অর্থ: তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে যুবাইর (রাঃ)-এর সঙ্গে হাররার নালার পানির ব্যাপারে ঝগড়া করল যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারী বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রাঃ) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবাইর রা, কে বলেন, হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাতো ভাই। এতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবাইর রাযি. বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি

এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, "তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে"।[১৭১]

বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলেন, সাহাবায়ে কেরামের কাছে শানে নুযূল বর্ণিত হওয়া মুসনাদ হাদীসের সমতুল্য।

আল্লামা হাকেম রহ. বলেন,

"إِذَا أَخْبَرَ الصَّحَابِيُّ الَّذِيْ شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيْلَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ كَذَا فَإِنَّهُ حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ"

অর্থ: কুরআন নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখেছেন এমন সাহাবি কোন আয়াতের ব্যাপারে যদি বলে যে তা অমুক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে তাহলে মুসনাদ হাদীসের সমমর্যাদায়।[১৭২]

শানে নুযূল সম্পর্কে লিখিত কিছু কিতাব:

স্বতন্ত্রভাবে শানে নুযূল নিয়ে অনেক উলামায়ে কেরাম কলম ধরেছেন। এ বিষয়ে লিখিত কিতাবের সংখ্যা অগণিত। আমি এখানে প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের পরিচিতি তুলে ধরছি।

১. "أَسْبَابُ النُّزُوْلِ لِعَلِيِّ الْمَدِيْنِيِّ" কিতাবটি লিখেছেন ইমাম আবুল হাসান আলী ইবনুল মাদানী রহ.। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২৩৪ হি.। তিনি ইলমে ইলাল এর বড় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি কিতাব হল "আল ইলাল ওয়া মাআরেফাতুর রিজাল"।

আল্লামা হাজি খালিফা বলেন, তাঁর এই কিতাবটি শানে নুযূল সম্পর্কে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাব।[১৭৩]

---

১৭১. আন-নিসাঃ ৬৫), সহীহ বুখারী-২৩৫৯, সহীহ মুসলিম-২৩৫৭, আবু দাউদ-৩৬৩৭, তিরমিযী-১৩৬৩, নাসায়ী-৫৪০৭, ইবনে মাজাহ, ১৫ মুসনাদে আহমদ-১৪১৯

১৭২. মা'আরেফাতু উলুমিল হাদিস-২০

১৭৩. কাশফুয যুনূন, মাদ্দাঃ আসবাবুন নুযূল

২. "أَسْبَابُ النُّزُوْلِ لِلْوَاحِدِيْ" কিতাবটি লিখেছেন প্রখ্যাত মুফাসসির আবুল হাসান আলী ইবনে আহমদ আল ওয়াহেদী রহ.। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৪৬৮ হিজরীতে।

কিতাবটি দাম্মামের দারুল ইসলাহ থেকে ৪৮৮ পৃষ্ঠায় ছেপেছে। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ থেকেও একটি নুসখা বের হয়েছে।

আল্লামা হাজি খালিফা বলেন, মুফাসিসর ওয়াহেদীর এ কিতাবটি সনদ উহ্য করে সংক্ষিপ্ত করেছেন আল্লামা বুরহানুদ্দিন আল জাবারী রহ.(মৃ: ৭৩২ হি.)।

৩. "أَسْبَابُ النُّزُوْلِ لِجَلَالِ الدِّيْنِ السُّيُوْطِيْ" কিতাবটির পুরো নাম "লুবাবুন নুকুল ফি আসবাবিন নুযূল। লিখেছেন জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর আস সুয়ুতি আশ শাফেয়ী রহ. (মৃ: ৯১১ হি./১৫০৫ খৃ.)। কিতাবটি মুআসসাতুল কুতুব থেকে ছেপেছে। কিতাবটিতে শানে নুযূল সম্পর্কে প্রায় সব বিষয়ই আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও কিতাবটি খুবই উপকারি। সকল তালেবে ইলমের সংগ্রহে থাকা চাই।

৪. "أَسْبَابُ النُّزُوْلِ" কিতাবটি লিখেছেন ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন আলী জাওযী বাগদাদী রহ. (মৃ: ৫৯৯ হি.)।

"اَلْعُجَابُ فِيْ بَيَانِ الْأَسْبَابِ لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيْ"

কিতাবটি লিখেছেন ইমাম শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃ: ৮৫২ হি.)।

কিতাবটি ২০০৯ খ্রি. দারু ইবনে হাযাম থেকে এক ভলিয়মে ছেপেছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৩৩।

৫. "تَسْهِيْلُ الْوُصُوْلِ إِلٰى مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ" কিতাবটি লিখেছেন শায়েখ খালেক আব্দুর রহমান রহ. (মৃ: ১৪২০ হি.)।

কিতাবটি ১৯৯৮ খ্রি. দারুল মাআরেফা বৈরুত থেকে এক ভলিয়মে ছেপেছে। মুসানেনফ এখানে পূর্ববর্তী সকল আসবাবুন নুযূলের কিতাবগুলোকে জমা করা চেষ্টা করেছেন। তিনি এতে কুরআন অনুযায়ী তারতীব দিয়ে অধ্যায়গুলো লিখেছেন।

৬. "الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ مِنْ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ" কিতাবটি লিখেছেন শায়েখ আবু আব্দুর রহমান মাকবাল বিন হাদী আল-ওয়াদেয়ী রহ. (মৃত্যু: ১৪২২ হি.)।

কিতাবটি দারু ইবনে হাযাম বৈরুত থেকে এক ভলিয়মে ছেপেছে। এটি ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে মাকতাবাতু সানআ আল-আসারিয়্যাহ থেকেও ছেপেছে।

লেখক এখানে সহীহ সনদে বর্ণিত শানে নুযূলগুলো জমা করার চেষ্টা করেছেন।

৭. "الْاِسْتِيْعَابُ فِيْ بَيَانِ الْأَسْبَابِ" কিতাবটি লিখেছেন শায়খ সালেম হেলালী ও মুহাম্মদ মুসা আলে নাসর রহ.।

কিতাবটি ১৪২৫ হি. দারু ইবনে হাযাম বৈরুত থেকে এক ভলিয়মে ছেপেছে।

এখানে সব ধরনের শানে নুযূল উল্লেখ করা হয়েছে তবে তা সূত্রনির্ভর।

৮. "الْمُحَرَّرُ فِيْ أَسْبَابِ النُّزُوْلِ" কিতাবটি লিখেছেন শায়েখ ডা. খালেদ ইবনে সুলায়মার মুজাইনি।

কিতাবটি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে দারু ইবনে জাওযী থেকে ছেপেছে।

কিতাবটির পুরো নাম হল,

(الْمُحَرَّرُ فِيْ أَسْبَابِ نُزُوْلِ الْقُرْآنِ مِنْ خِلَالِ الْكُتُبِ التِّسْعَةِ، دِرَاسَةُ الْأَسْبَابِ رِوَايَةً وَدِرَايَةً)

লেখক এখানে নয়টি হাদীসের কিতাবে বর্ণিত শানে নুযূলগুলো উল্লেখ করেছেন। নয়টি কিতাব হল:

ক. সহীহ বুখারী

খ. সহীহ মুসলিম

গ. সুনানে আবু দাউদ

ঘ. সুনানে তিরমিযী

ঙ. সুনানে নাসায়ী

চ. সুনানে ইবনে মাজাহ

ছ. মুআত্তা মালেক

জ. মুসনাদে আহমদ

ঝ. সুনানে দারেমী।

৯. "أَسْبَابُ النُّزُوْلِ" কিতাবটির পুরো নাম হল-

(أَسْبَابُ النُّزُوْلِ وَ أَثَرُهَا فِيْ بَيَانِ النُّصُوْصِ، دِرَاسَةً مُقَارِنَةً بَيْنَ التَّفْسِيْرِ وَالْفِقْهِ)

কিতাবটি লিখেছেন শায়খ ইমাদুদ্দিন মুহাম্মদ আর-রাশীদ। কিতাবটি ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে দারুশ শিহাব থেকে ছেপেছে।

পার্ট-৬

এ অধ্যায়ে রয়েছে:

নাসখ শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

শাব্দিক অর্থ:

আহলে আরব এই শব্দটিকে চারটি অর্থে ব্যবহার করে। তা হল:

১. (الْإِزَالَةُ) দূর করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

অর্থ: আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূরীভূত করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়।[১৭৪]

২. (التَّبْدِيْلُ) পরিবর্তন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ: যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত (পরিবর্তনের মাধ্যমে) উপস্থিত করি এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে, আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।[১৭৫]

---

১৭৪. সূরা হাজ্জ-৫২

১৭৫. সূরা নাহল, ১০১

৩. (التَّحْوِيْلُ) হস্তান্তর করা। যেমন বলা হয়,

تَنَاسُخُ الْمَوَارِيْثِ يَعْنِيْ تَحْوِيْلُ الْمِيْرَاثِ مِنْ وَاحِدٍ إِلٰى آخَرَ.

অর্থ: মিরাছ এক ব্যক্তির থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর হওয়া।

৪. (نَقْلُ شَيْئٍ مِنْ مَكَانٍ إِلٰى مَكَانٍ آخَرَ) কোন জিনিস এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

هٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ: আমার কাছে রক্ষিত এ আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।[১৭৬]

অর্থাৎ, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড তার থেকে তা স্থানান্তরিত করে আমলনামায় লেখা হয়।[১৭৭]

পারিভাষিক অর্থ:

আল্লামা কাতাদা ইবনে দিয়ামা রহ. বলেন,

أَمَّا النَّسْخُ فِيْ الْاِصْطِلَاحِ فَهُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ، فَالْحُكْمُ الْمَرْفُوْعُ يُسَمّٰى (الْمَنْسُوْخُ)، وَالدَّلِيْلُ الرَّافِعُ يُسَمّٰى (النَّاسِخُ) وَيُسَمّٰى الرَّفْعُ (النَّسْخُ).

অর্থ: পারিভাষিক অর্থে নাসখ বলা হয় পরবর্তী দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী দলিলকে রহিত করা।

রহিত হওয়া হুকুমকে মানসূখ ও রহিতকারী দলিলকে নাসেখ আর এভাবে রহিত হওয়াকে নাসখ বলে।[১৭৮]

---

১৭৬. সূরা জাসিয়া-২৯
১৭৭. আল বুরহান-৩৪৭, নাসেখ মানসূখ লি ইবনে হাযম-৬
১৭৮. নাসেখ মানসূখ লি কাতাদা-৫

ড. মান্না' আল-কাত্তান' বলেন,

النَّسْخُ فِيْ الْاِصْطِلَاحِ رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخَطَابٍ شَرْعِيٍّ.

অর্থ: পারিভাষিক অর্থে নাসখ বলা হয়, শরয়ী হুকুমকে শরয়ী সম্বোধনের মাধ্যমে রহিত করা।[১৭৯]

এ ফনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা

উলামায়ে কেরাম এই ফনকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। এ ইলম জানা থাকলে পাঠকের কাছে শরয়ী আহকাম পারস্পরিক সাংঘর্ষিক মনে হবে না।

আল্লামা যুরকানী রহ. বলেন, নাসখের বিধান সম্পর্কে জানলে পাঠকের প্রশান্তি অনুভব হয়, শরয়ী আহকামের পারস্পরিক সংঘর্ষ দূরীভুত হয় ও মনের ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।[১৮০]

কুরআনুল কারীমের তাফসীর করার পূর্বশর্ত হলো নাসেখ মানসূখের জ্ঞান অর্জন করা।

অনেক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, নাসেখ-মানসুখের জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কুরআনের তাফসীর করা জায়েয নয়।[১৮১]

নাসেখ মানসুখের জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সালাফ থেকে অনেক আছার বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাদের কয়েকটি আছার উল্লেখ করা হল।

১. হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একদা কুফার একটি জামে মসজিদে প্রবেশ করে আব্দুর রহমান বিন দাআব নামক একজন ব্যক্তি বসে আছেন। তাঁর চতুর্পাশে লোকজন বসে বিভিন্ন বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করছেন এবং সে হালালের সাথে হারামকে গুলিয়ে ফেলছিলেন।

হযরত আলী রাযি. তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমার কি নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?"

---

১৭৯. মাবাহিছ ফি উলূমিল কুরআন-২২৪

১৮০. মানাহিলুল ইরফান-২/১৯৪

১৮১. নাসেখ মানসূখ লি কাতাদা-৫

আব্দুর রহমান বলেন, না। হযরত আলী রাযি. তাকে বলেন, তুমি নিজে বরবাদ হয়েছ এবং মানুষকে বরবাদ করছ![১৮২]

২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

অর্থ: তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।[১৮৩]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, এখানে হিকমত দ্বারা নাসেখ-মানসূখের জ্ঞান উদ্দেশ্য।[১৮৪]

উপরোক্ত আছারদ্বয় দ্বারা নাসেখ-মানসূখের ইলম জানার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

নাসেখ-মানসূখের ইলম যেভাবে আমরা জানবঃ

নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে জানার চারটি পদ্ধতি সালাফ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ তিনের বাহিরে অন্য কোনভাবে তা অর্জন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। গ্রহণযোগ্য চারটি পদ্ধতি হলঃ

১. স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যাওয়া।

মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا"

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করবে"।[১৮৫]

---

১৮২. নাসেখ মানসূখ লি ইবনে সালামা-৪, মাবাহিছ-২২৫
১৮৩. সূরা বাকারা-২৬৯
১৮৪. মাবাহিস-২২৫
১৮৫. সহীহ মুসলিম-৯৭৭

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে সাহাবায়ে কেরামকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেন। অতপর তিনি নিজেই এ কথা বলার মাধ্যমে সে নিষেধাজ্ঞা রহিত করে দেন। সুতরাং বুঝা গেল তিনি নিজেই তাঁর পূর্ববর্তী বিধানকে রহিত করেন।

২. সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের মাধ্যমে রহিত হওয়ার বিধান জানা যাবে। সাহাবায়ে কেরাম নুযূলে ওহীর সময় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাঁরা রহিত হওয়া সম্পর্কে অধিক অবগত থাকবেন এটাই যুক্তির কথা। তাই তাঁরা কোন বিধান রহিত হওয়ার কথা বললে তা গ্রহণযোগ্য।

৩. উম্মতে মুহাম্মদীর কোন বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়ে যাওয়া। কারণ, উম্মতে মুহাম্মদীর ইজমাও একটি শক্তিশালী দলিল বরং এটি শরয়ী গ্রহণযোগ্য চার দলিলের অন্যতম একটি দলিল।

৪. ইতিহাসের মাধ্যমে পূর্বাপর মিলিয়ে নাসেখ-মানসূখ নির্ণয় করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই ইতিহাস সহীহ সূত্রে বর্ণিত হতে হবে।

নাসেখ মানসূখ জানার এ চারটি পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। এখানে আকল ও ধারণার কোন স্থান নেই। সুতরাং আকল খাটিয়ে বা ধারণার উপর ভিত্তি করে মানসূখ নির্ণয় করা বৈধ নয়।[১৮৬]

নাসখের প্রকারভেদ:

নাসখ মূলত চার ধরনের হয়ে থাকে,

১. (نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ) কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের রহিতকরণ।

২. (نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ) হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিতকরণ।

---

১৮৬. আল ইতকান

৩. (نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে হাদীসকে রহিতকরণ।

৪. (نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ) এক হাদীসের মাধ্যমে অন্য হাদীসের রহিতকরণ।

প্রথম প্রকার:

(نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ) কুরআনের এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের রহিতকরণ।

এ প্রকার নাসখের ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন। এ নিয়ে কারও দ্বিমত নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ: পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরিয়ে ইবাদত করবে, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।[১৮৭]

কুরআনের এ আয়াতটি নিম্নোদ্ধৃত আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ، وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই তোমার পালনকর্তার

১৮৭. বাকারা-১১৫

পক্ষ থেকে সত্য বিধান। আল্লাহ বেখবর নন ওই সমস্ত কর্ম সম্পর্কে, যা তারা করে।[১৮৮]

সুতরাং প্রথম আয়াতটি মানসূখ তথা রহিত বিধান। আর দ্বিতীয় আয়াতটি নাসেখ; পূর্বের বিধানকে রহিতকারী আয়াত।

দ্বিতীয় প্রকার:

(نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ) হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিতকরণ।

এ প্রকার বিধান দু'ভাগে বিভক্ত।

১. খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর বৈধতার বিপক্ষে। তাঁরা বলেন, কুরআন মুতাওয়াতির। তা অকাট্য বিধান। আর খবরে ওয়াহেদ অকাট্য নয়, বরং তা যন্নি বা অনুমান নির্ভর। তাই অকাট্য বিধানকে অনুমান নির্ভর দলিলের মাধ্যমে রহিত করা বৈধ নয়।

আল্লামা ইবনে হাযাম, আল্লামা তুওফী ও বর্তমান সময়কালের শায়খ উসাইমিন বলেন, খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া সম্ভব এবং তা জায়েজ।[১৮৯]

২. মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া।

অধিকাংশ ইমাম এমত পোষণ করেছেন যে, মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া বৈধ। কেননা, দুটোই সুনিশ্চিত ওয়াহী। তাই একটি অপরটির মাধ্যমে নাসখ হওয়া সম্ভব। এটি ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ রহ.-এর মাযহাব।

দলিলস্বরূপ পেশ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

অর্থ: এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। যা বলেন তা হল কুরআন, ওহী-যা প্রত্যাদেশ হয়।[১৯০]

---

১৮৮. সূরা বাকারা-১৪৪

১৮৯. আল-ইহকাম লি-ইবনে হাযম: ৪/১০৭

১৯০. সূরা নাজম: ৩-৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ۝

অর্থ: আপনার কাছে আমি স্মরণিকা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ওইসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[১৯১]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তা মানুষের সামনে সুস্পষ্ট করে দেন। নাসখ তা রহিতকরণ এটিও এক প্রকার সুস্পষ্ট করণের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে কুরআনের আয়াত রহিত হওয়া বৈধ।

ইমাম শাফী রহ. ও যাহরী মাযহাব হলো, মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমেও কুরআনের আয়াত রহিত করা বৈধ নয়।

দলিল হিসেবে পেশ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۝

অর্থ: আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান।[১৯২]

তাদের যুক্তি হাদীস কুরআনের চেয়ে উত্তম বা সমপর্যায়ের নয়। তাই হাদীসের মাধ্যমে কুরআন রহিত করা যাবে না।

তৃতীয় প্রকার:

(نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ) কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে হাদীসকে রহিতকরণ।

অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এ প্রকার নাসখকেও জায়েজ বলেছেন।

১৯১. সূরা নাহল-৪৪
১৯২. সূরা বাকারা-১০৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামকে বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ বিধানকে কুরআনে একটি আয়াতের মাধ্যমে রহিত করে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۴۴﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য বিধান। আল্লাহ অনবগত নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে।[১৯৩]

এখানে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে হাদীসের বিধানকে রহিত করা হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে রমযানের রাতে স্ত্রী সহবাস করা থেকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তা কুরআনের আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۪

১৯৩. সূরা বাকারা-১৪৪

অর্থ: রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর।[১৯৪]

সূরা বাকারার এ আয়াতটির মাধ্যমে হাদীসের নিষেধাজ্ঞার বিধানটি রহিত হয়েছে। এ দুটো জমহুর উলামায়ে কেরামের দলিল।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, এ প্রকার নাসখও বৈধ নয়।

চতুর্থ প্রকারঃ

(نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ) এক হাদীসের মাধ্যমে অন্য হাদীসের রহিতকরণ।

এ প্রকার নাসখ চারভাগে বিভক্তঃ

১. نَسْخُ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِمُتَوَاتِرَةٍ – মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে মুতাওয়াতির হাদীসকে রহিত করা।

এ প্রকারের উদাহরণ পাওয়া দুষ্কর। মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে মুতাওয়াতির হাদীসকে রহিত করার উদাহরণ বিরল।

২. نَسْخُ سُنَّةٍ أَحَادِيَةٍ بِأَحَادِيَةٍ – খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে খবরে ওয়াহেদকে রহিত করা।

মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ، فَزُوْرُوْهَا"

অর্থ: "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করবে"।[১৯৫]

---

১৯৪. সূরা বাকারা-১৮৭

১৯৫. সহীহ মুসলিম, ৯৭৭

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত করতে মানা করা ও অনুমতি প্রদান করা উভয়টি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত।

৩. نَسْخُ سُنَّةٍ آحَادِيَةٍ بِسُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ - মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে খবরে ওয়াহেদকে রহিত করা।

৪. نَسْخُ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ بِسُنَّةٍ آحَادِيَةٍ - খবরে ওয়াহেদের মাধ্যমে মুতাওয়াতির হাদীসকে রহিত করা।

প্রথম তিন প্রকার জায়েজ। চার নম্বর প্রকার নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। জুমহুর উলামায়ে কেরাম বলেন, তা বৈধ। হযরত শাফেয়ী রহ. ও যাহেরী মাযহাবে তা বৈধ নয়।

কুরআনের আয়াত রহিত হওয়ার ধরনসমূহ:

কুরআনের আয়াত রহিত হয় তিনভাবে:

১. نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَ الْحُكْمِ مَعًا - তেলাওয়াত ও হুকুম উভয়টি রহিত হয়ে যাওয়া।

আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

অর্থ: তিনি বলেন, কুরআনে "দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়" এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। অতঃপর তা রহিত হয়ে যায় "পাঁচবার পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়" এর দ্বারা। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত করা হত"।[১৯৬]

---

১৯৬. সহীহ মুসলিম, ৩৪৮৯

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি.-এর উপরোক্ত উক্তিটি দ্বারা বুঝা গেল "দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়" এ আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। আর আয়েশা রাযি.-এর শেষ বাক্যটি "অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসেবে তেলাওয়াত করা হত।" দ্বারা বুঝা যায় এই আয়াতটির তেলাওয়াত বহাল আছে কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। কারণ এই আয়াতটি মাসহাফে উসমানীতে নেই। সুতরাং তাঁর কথার উদ্দেশ্য হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করার পর মাসহাফে উসমানী তৈরি হবার পূর্বে এই আয়াতের তেলাওয়াত হত।

সর্বোপরি "দশবার দুধপানে হারাম সাব্যস্ত হয়" এ আয়াতটির হুকুম ও তেলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে।

সালাফ-খালাফ সবাই এ ব্যাপারে এক মত যে, এ প্রকার কুরআনের আয়াতের উপর আমল করা যাবে না।

২. نَسْخُ الْحُكْمِ وَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ - হুকুম রহিত হয়ে তেলাওয়াত বাকি থাকা।

এ প্রকার নাসখের ব্যাপারে অনেক কিতাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল:

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পার।

(রোজা রাখার বিধান) হাতেগোনা কয়েকটি দিনের জন্য অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা আদায় করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। যে ব্যক্তি খুশী মনে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোজা রাখ, তবে তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।[১৯৭]

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে রোজা রাখা ও ফিদয়া আদায়ের মধ্যে স্বাধীনতা দিয়েছেন। রোজা রাখা বাধ্যতামূলক নয়।

এ বিধানটি আল্লাহ তাআলা পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে রহিত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ: রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।[১৯৮]

---

১৯৭. সূরা বাকারা: ১৮৩-৮৪

১৯৮. সূরা বাকারা-১৮৫

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছাধীনতার বিধানকে রহিত করে রোজা রাখা আবশ্যক করে দিয়েছেন।

সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেলেও তেলাওয়াত বাকি আছে।

প্রশ্ন আসে, হুকুম রহিত হয়ে গেলে আয়াতের তেলাওয়াত বাকি থাকার হিকমত কি?

এর উত্তর দুটি–

এক: আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি আল্লাহ তাআলার বিধান জানার জন্য। অনুরূপভাবে আমরা এ জন্যও তেলাওয়াত করি যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। তা পাঠ করলেই সাওয়াব অর্জিত হয়। তাই হুকুম রহিত আয়াতকেও পাঠ করে সাওয়াব পাবার উদ্দেশ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে।

দুই: আল্লাহ তাআলা হুকুম রহিত করেন সাধারণত বান্দাদের শিথিলতার জন্য। তাই হুকুম রহিত আয়াতকে তেলাওয়াতের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে বান্দারা তা তেলাওয়াত করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

৩. نَسْخُ التِّلَاوَةِ مَعَ بَقَاءِ الْحُكْمِ - তেলাওয়াত রহিত হয়ে হুকুম বাকি থাকা।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–

كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ).

অর্থ: সূরা আহযাব সূরা বাকারার সমপর্যায়ে ছিল। সূরা আহযাবে একটি আয়াত ছিল, "বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তোমরা তাকে পাথরাঘাত করে হত্যা করো। এটা আল্লাহ তাআলার শাস্তি। আর আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।"[১৯৯]

১৯৯. সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪৪২৮

এ আয়াতটি তেলাওয়াত রহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু হুকুম এখনো কার্যকর।

এ প্রকারের উপর আমল করা যাবে যদি তা সমস্ত উম্মত একবাক্যে গ্রহণ করে নেয়।[২০০]

নাসেখ-মানসূখ সম্পর্কে লেখা কিছু কিতাবের পরিচিতি:

১. (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ فِيْ كِتَابِ اللهِ) কিতাবটি লিখেছেন কাতাদা ইবনে দিআমা সাদুসী। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১১৭ হিজরীতে। কিতাবটি মুআস্‌সাসাতুর রিসালা বৈরুত থেকে ছেপেছে। কিতাবটি তাহকীক করেছেন শায়খ হাতেম সালেহ যামেন।

ধারণা করা হয়, এ কিতাবটি এ বিষয়ে সর্বপ্রথম কিতাব। যদিও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আতা ইবনে মুসলিম (মৃ. ১১৫) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কলম ধরেছেন কিন্তু কিতাবটি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি।

কাতাদা রহ. তাঁর এ কিতাবে রেওয়ায়েতের আলোকে নাসখের বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। কিতাবের শুরুতে মুআস্‌সাসাতুর রিসালার পক্ষ থেকে নাসখ বিষয়ক একটি মুকাদ্দিমা সংযোজন করা হয়েছে।

২. (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ فِيْ الْقُرْآنِ الْعَزِيْزِ وَمَا فِيْهِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ) কিতাবটি লিখেছেন আল্লামা আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম হারাবী। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২২৪ হিজরীতে। কিতাবটি কালো লাল প্রচ্ছদে মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ থেকে ছেপেছে। কিতাবটি তাহকীক করেছেন শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ।

লেখক-নাসেখ মানসূখ ইলমের ফাযায়েল বয়ান করা দ্বারা কিতাবটি শুরু করেছেন। সবচে মজার বিষয় হল, লেখক এখানে প্রত্যেকটি অধ্যায় নুসূস বা আছার দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে, কিতাবটি এ ফনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মুফিদ একটি কিতাব।

---

২০০. মাবাহিছ, ২৩০

৩. (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ فِيْ الْقُرْآنِ) কিতাবটি লিখেছেন আল্লামা ইবনে হাযম উন্দুলুসী। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৩২০ হিজরীতে। কিতাবটি এক ভলিয়মে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত থেকে ১৪০৬ হি. মুতাবেক ১৯৮৬ সনে ছেপেছে। কিতাবটি তাহকীক করেছেন শায়খ আব্দুল গাফ্ফার সুলাইমান বুন্দারী।

কিতাবটি বৈরুতের মানশুরাতুল জুমাল থেকে সাদা কালো প্রচ্ছদে ছেপেছে। লেখক এখানে সুবিন্যস্তভাবে নাসেখ-মানসূখের অধ্যায়গুলো উল্লেখ করেছেন।

৪. (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ) কিতাবটি লিখেছেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবু বকর। তিনি ইবনুল আরাবি নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্যুবরণ করেন ৫৪৩ হি. মুতাবেক ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে। কিতাবটি মাকতাবাতুস সাকাফাতিদ দ্বীনিয়্যাহ থেকে ১৪১৩ হি. মুতাবেক ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে ছেপেছে। তাহকীক করেছেন শায়খ আব্দুল কাবীর আলুবী। এটি মূলত একটি গবেষণাধর্মী একটি কিতাব। শায়খ আলুবী ডক্টরেট করার জন্য কিতাবটি তাহকীক করেছেন।

ইবনুল আরাবীর এ গ্রন্থটি সকলের নিকট সমাদৃত। কারণ, তিনি এখানে নাসখ বিষয়ক সকল আলোচনা যুক্তির আলোকে করেছেন।

৫. (الْإِيْضَاحُ لِنَاسِخِ الْقُرْآنِ وَمَنْسُوْخِه) কিতাবটি লিখেছেন আবু মুহাম্মদ মাক্কী ইবনে তালেব কায়সী। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে। কিতাবটি দারুল মানারা জেদ্দা থেকে ১৪০৬ হি. মোতাবেক ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ছেপেছে। কিতাবটি তাহকীক করেছেন ড. আহমদ হাসান ফারহাত। লেখক এখানে মুতাকাদ্দিমীনদের বিক্ষিপ্ত আলোচনা একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন।

পার্ট-৭

এ অধ্যায়ে রয়েছে:

কুরআন একটি মুজেযা:

কুরআন শিখা ও শিখানো উভয়টি ফরযে কেফায়া। একজন দায়িত্ব পালন করলে সবার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। যারা এই শেখা শেখানোর সাথে জড়িত তাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ উপাধি দেওয়া হয়েছে।

উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অর্থ: যারা কুরআন শিখে ও শিখায় তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।[২০১]

কুরআন হিফয করে সংরক্ষণ করা আবশ্যক। যাতে অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের মত কুরআন পরিবর্তন না হয়। মুতাওয়াতির সনদে সর্বকালে তা প্রচলিত থাকে। আলহামদুলিল্লাহ এ পর্যন্ত এমনটিই হয়ে আসছে। এটা ইসলামধর্মের বৈশিষ্ট্য। কুরআনের মুজেযা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থ: আমি স্বয়ং এ উপদেশগ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।[২০২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: আল্লাহর কথার কখনো হেরফের হয় না। এটাই মহাসফলতা।[২০৩]

---

২০১. সহীহ বুখারী-৫০২৭
২০২. সূরা হুজর-৯
২০৩. সূরা ইউনুস-৬৪

কুরআন তরজমাঃ

আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ার হিকমত

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাধ্যমে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা আরববাসীদেরকে নির্বাচন করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করার জন্য। তাঁরা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে সর্বকালের সেরা মানুষে পরিণত হয়।

আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে নির্বাচন করেছেন ওহীর ধারক-বাহক হিসেবে। সাহাবায়ে কেরাম পুরো পৃথিবীবাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। ইসলামের অনুপম আদর্শে পৃথিবীবাসীকে বিমুগ্ধ করতেন। তাই অবস্থার দাবীই ছিল কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه"

অর্থঃ প্রত্যেক রাসূলের কাছে আমি তার সম্প্রদায়ের ভাষায় ওহী নাযিল করেছি।[২০৪]

আর যেহেতু কুরআন নাযিলকালীন উদ্দেশ্য ছিল আরববাসীদেরকে সতর্ককরণ এবং তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দেওয়া তাই তাদের ভাষাই কুরআন নাযিল হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"وَإِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُوْنَ"

অর্থঃ এটা (কুরআন) তোমার এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ স্বরূপ। অচিরেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।[২০৫]

---

২০৪. সূরা ইবরাহীম-৪
২০৫. সূরা জুখরুফ-৪৪

"তরজমা" শব্দের বিশ্লেষণ:

এর চারটি অর্থ রয়েছে,

১. (تَبْلِيْغُ الْكَلَامِ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ) কথা পৌঁছে নি এমন কারও কাছে কথা পৌঁছে দেওয়া।

২. (تَفْسِيْرُ الْكَلَامِ بِلُغَتِهِ الَّتِيْ جَاءَ بِهَا) একই ভাষায় কোন বাক্যকে স্পষ্ট করা। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে বলা হয়, "نِعْمَ تَرْجُمَانُ الْقُرْآنِ"

৩. (تَفْسِيْرُ الْكَلَامِ بِلُغَةٍ غَيْرِ لُغَتِه) কোন বাক্যকে একই ভাষায় সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করা।

৪. (نَقْلُ الْكَلَامِ مِنْ لُغَةٍ إِلٰى أُخْرٰى) এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বাক্যটির অর্থ প্রকাশ করা।

"তরজমা" শব্দের পারিভাষিক অর্থ:

التَّرْجَمَةُ فِي الْعُرْفِ وَالْاِصْطِلَاحِ: "هِيَ التَّعْبِيْرُ عَنْ مَعْنٰى كَلَامٍ فِيْ لُغَةٍ بِكَلَامٍ آخَرَ مِنْ لُغَةٍ أُخْرٰى مَعَ الْوَفَاءِ بِجَمِيْعِ مَعَانِيْهِ وَمَقَاصِدِه"

অর্থ: তরজমা বলা হয় কোন বাক্যের অর্থ তার সমস্ত মর্ম ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিপূর্ণরূপে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করা।[২০৬]

উপরোক্ত পরিচয় দ্বারা বুঝা গেল তরজমা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে:

ক. মূলের অর্থ পুরোপুরি সামনে থাকতে হবে।

খ. মূল লেখার যে উদ্দেশ্য তা পুরোপুরি রক্ষা করতে হবে।

গ. মূলের কোন শব্দ বা বাক্য ছাড়া যাবে না।

ঘ. তরজমা আর মূল লেখার বিধান একই। তাই উভয়টিই সর্বক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

---

২০৬. আল-ওয়াযেহ ফী উলূমিল কুরআন-২৫৮)

তরজমা ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্যসমূহ:

পূর্বে আমরা জেনেছি তরজমা বলা হয়, কোন বাক্যের অর্থ তার সমস্ত মর্ম ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিপূর্ণরূপে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করা।

আর তাফসীর বলা হয়, মানবীয় সাধ্যের মাধ্যমে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের দ্বারা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা।

তাহলে আমরা বলতে পারি তরজমা ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য চারটি:

১. তরজমা হল কুরআনের অর্থ বা মর্মকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করা আর তাফসীর হল কুরআনের আয়াতকে নিজ বুঝ শক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।
২. তরজমায় নসের শব্দকে গুরুত্ব দেওয়া হয় আর তাফসীরে উদ্দেশ্য থাকে নসের মর্মকে নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে দেওয়া।
৩. তরজমায় আয়াতের শব্দ ও উদ্দেশ্য কে সামনে রাখতে হয় আর তাফসীরে তা লক্ষ্য রাখা জরুরি নয়।
৪. তরজমাকারীকে মুতারজিম আর তাফসীরকারীকে মুফাসসির বলা হয়।

কুরআন তরজমা করার বিধান:

কুরআন বিশেষ মুজেযা। যার সমপর্যায়ে কোন কিতাব আনা অসম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন, এটি এমন একটি কিতাব যাতে নেই কোন শুবাহ সন্দেহ।[২০৭]

নবুওয়তের সময়কালে মুশরিকে মক্কাকে আল্লাহ তাআলা বহুবার কুরআনের মত একটি গ্রন্থ, সূরা বা আয়াত বানিয়ে দেখানোর চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু মক্কার কাফের পুরো পৃথিবীবাসী তখন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। এই কথা বলতে বাধ্য হয় "এটা মানবীয় কোন কথা নয়"।

২০৭. সূরা বাকারা-২

নিঃসন্দেহে এটা মুজেযা। এটি আল্লাহ তাআলার কালাম। ইসলাম ধর্ম সত্যতার জন্য এ কিতাবটিই যথেষ্ট।

মুজেযা বলা হয় "যা মানুষের সাধ্যের বাহিরে"। আর তরজমার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি তা হল, কোন বাক্যের অর্থ তার সমস্ত মর্ম ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিপূর্ণরূপে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, কুরআন যেহেতু মানবীয় ক্ষমতার বাহিরে একটি মুজেযা তাই এর অনুবাদ করা অসম্ভব বিষয়। কেননা, মুজেযাপূর্ণ কালামের পুরোপুরি মর্ম ও উদ্দেশ্য অন্যভাষায় প্রকাশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তাই কুরআনের বাস্তবিক অনুবাদ করা সম্ভব নয়।

মূলকথাঃ

দুটি কারণে বাস্তবিক অর্থে কুরআনের অনুবাদ অসম্ভব। তা হলঃ

১. কুরআন আল্লাহর কালাম মুজেযাপূর্ণ বাণী। মুজেযা মানুষের সাধ্যের বহির্গত বিষয তাই এর অনুবাদ সম্ভব নয়।
২. অনুবাদ আর মূলের একই হুকুম। সুতরাং মূল কুরআন আর কুরআনের তরজমা অনুরূপ ধরা হবে। আর কুরআনের অনুরূপ আনা নিঃসন্দেহে অসম্ভব।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا﴿۸۸﴾

অর্থঃ হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি মানব ও জ্বিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।[২০৮]

---

২০৮. সূরা ইসরা-৮৮

সুতরাং আমরা বলতে পারি পূর্বোক্ত অর্থে কুরআন অনুবাদ করা অসম্ভব। তবে যদি কুরআনের অনুবাদ করা হয় কুরআনকে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করার অর্থে তাহলে তা বৈধ। কেননা যে ব্যক্তি আরবী ভালোভাবে বুঝে না তার কাছে কুরআনের মর্ম বোধগম্য হবে না এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তাকে নিজ ভাষায় বুঝানোর প্রয়োজন হয়। যেভাবে আরবী থেকে আরবী ব্যাখ্যা করে বুঝানো হয় অনুরূপভাবে আরবী থেকে অন্য কোন ভাষায় এই উদ্দেশ্যে অনুবাদ করা বৈধ হবে।[২০৯]

সর্বপ্রথম যিনি বাংলায় কুরআন তরজমা করেছিলেন:

ইংরেজিতে ১৭৩৪ সালে প্রথম কুরআনের তরজমা করেন জর্জ সেল। ফার্সীতে কুরআনের কিছু অংশের প্রথম তরজমা বা অনুবাদ করেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সালমান ফার্সী রাযি.। প্রিয় নবীর ইন্তিকালের প্রায় ৩৫০ বছর পর ইরানের সাসানী বাদশা আবু সালেহ মানসুর ইবন নূহ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ফার্সী অনুবাদ করেন। কুরআনের ফার্সী অনুবাদের এ বিরল কাজের পাশাপাশি তিনি মুসলিম ইতিহাসের প্রথম পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ ইমাম মুহাম্মদ ইবন জারীর আত-তাবারীর ৪০ খন্ডে সমাপ্ত বিশাল আরবী তফসীর 'তাফসীরু জামিইল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন'(তাফসীরে তাবারী)-এর ফার্সী অনুবাদ করেন। আমাদের এ ভারতীয় উপমহাদেশে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ. কুরআনের যে ফার্সী ভাষান্তর করেছিলেন, তা ছিলো আরো ৮০০ বছর পরের ঘটনা। প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ, ১৭৭৬ সালে শাহ রফিউদ্দীন ও ১৭৮০ সালে শাহ আব্দুল কাদের কুরআনের উর্দু অনুবাদ করেন। তবে পুরো কুরআন ফার্সী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন সালেহ মাসুর বিন নূহ; ৩৬০ হিজরীতে। আর ১৮০০ সালের গোড়ার দিকে উর্দু ভাষায় প্রথম কুরআনের অনুবাদ করেন শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ.।

২০৯. আল ওয়াযেহ-২৬৪

একটি প্রচলিত বর্ণনা ও তার সমাধানঃ

পবিত্র কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কে? এমন প্রশ্নে অনেকে উত্তর দিবে, সকলেই জানা বাবু গিরিশচন্দ্র সেন কুরআনের প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এ তথ্য অনেক বই-পুস্তকে পাওয়া যায়। এটি লোকমুখে প্রচলিত। অনেকে বিভিন্ন স্থানে এ তথ্য পরিবেশন করে বিভ্রান্তি ছড়ান। এমনকি পাঠ্যপুস্তকেও দুঃখজনকভাবে এ তথ্য পাওয়া যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র সেনের জীবনী বিষয়ক পুস্তিকাতেও তাকে কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই আপামর জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। তাদের চোখের অগোচরে থেকে যায় সত্যটি। তাদের ধারণায়-ই থাকে না যে, প্রকৃত সত্য এটা নয়। লেখক ও বক্তারা যাচাই করারও প্রয়োজন বোধ করে না।

তাহলে প্রকৃত সত্য কি?

সর্বপ্রথম ১৮০৮ সালে বাংলা ভাষায় কুরআন আংশিক অনুবাদ করেন মাওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়া। এরপর ১৮৩৬ সালে বাংলা ভাষায় কুরআন পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন মৌলভী নঈমুদ্দীন। গিরিশচন্দ্র সেন শুধু উক্ত অনুবাদ পুস্তক আকারে সন্নিবেশ করেন। তার প্রকাশনা থেকে তিনি তা ছেপেছেন। তাই গিরিশচন্দ্র সেন হচ্ছেন প্রকাশক মাত্র। তাও ৫০ বছর পর ১৮৮৬ সালে। সুতরাং কুরআন শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদ গিরিশচন্দ্র সেন নন। বরং মৌলভী নঈমুদ্দীনই পূর্ণাঙ্গ কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক। আর মাওলানা আমীরুদ্দীন বসুনিয়া হলেন বাংলা ভাষায় প্রথম কুরআনের আংশিক অনুবাদক।[২১০]

সমাপ্ত

---

২১০. দৈনিক সংগ্রামঃ ২১.০৭.২০১৮ ঈ.
দৈনিক নয়াদিগন্তঃ ১৭.১০.২০১৮ ঈ.

কেন পড়বেন এ বই?

মূল্যবান জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত; যদিও তা অর্জন করা কষ্টসাধ্য। কেবল সাহসী ও লক্ষ্যস্থির দৃঢ়প্রত্যয়ী সাধকগণই তা অর্জন করতে পারে। বিষয়টা সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মুক্তা কুড়িয়ে আনা সেই ডুবুরির মতোই। শত শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে যে এ দুঃসাধ্যকে সাধন করে। তেমনি মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর নাযিলকৃত এক মহামূল্যবান ঐশীগ্রন্থ, তাই এ পথে বিচরণ করতে হলে কুরআন মাজিদের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয় ধাপে ধাপে জানতে হবে এবং সে বিষয়গুলোতে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে।

কুরআন হলো মানব জীবনের জন্য হেদায়েত ও পথনির্দেশ। কুরআন নাযিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানব জাতি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে এবং গভীর জ্ঞানসমুদ্র থেকে মণি-মুক্তা কুড়িয়ে আনবে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কুরআন বোঝার এ যাত্রা পথে সাহায্য করতেই 'কুরআন পরিচিতি' বইটির আবির্ভাব।

বইটিতে যা পাবেন-

- এক. কুরআন পরিচিতি।
- দুই. কুরআন সংকলনের ইতিহাস।
- তিন. ইসলামি ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থের পরিচিতি।
- চার. তাফসির শাস্ত্রের মূলনীতি।
- পাঁচ. কুরআনের আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট।
- ছয়. কুরআনের আয়াত রদ-বদলের প্রেক্ষাপট।
- সাত. কুরআন অনুবাদের নীতিমালা।
- আট. সর্বপ্রথম যিনি কুরআন অনুবাদ করেন।

এছাড়াও এই বিষয়ের একজন প্রাথমিক পাঠকের জন্য রয়েছে যথেষ্ট রসদ, যা উচ্চতর গবেষণার দিকে পথনির্দেশ করবে। আশা করি বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য একটি মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

যেকোন বই ঘরে বসে পেতে ভিজিট করুন-
facebook.com/nurbookshop

Cover design : ibrahim kobbadi
...ishkar : 01815260469